অন্নদাশঙ্কর রায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

সেজকাকা ও সেজকাকিমার
শ্রীচরণে

সূচীপত্র

ভূমিকা

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাহিত্যিক জনাব মাহবুব-উল আলম সাহেবের সঙ্গে আমার পত্রালাপ তাঁর ও আমার উভয়ের নামে "আলাপ" বলে একখানি বই হয়ে বেরোয়। ঢাকায় মুদ্রিত ও চট্টগ্রামে প্রকাশিত ১৯৫৩ সালের সেই বই ভারতে প্রচারিত হয়নি। বইয়ের যেটুকু অংশ আমার পত্রাবলী কেবল সেইটুকু "পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা" এই নতুন নামে ইতিমধ্যে পত্রিকাযোগে ভারতে প্রচারিত হয়েছে। এবার "অপ্রমাদ" নামক প্রবন্ধপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হলো।

"অপ্রমাদ" নামকরণেরও একটু তাৎপর্য আছে। অহিংসার মতো অপ্রমাদও প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অগ্রগণ্য সূত্র। অহিংসা যারা মানবে না তারা যদি অপ্রমাদও না মানে তবে ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতীয়দের আয়ত্তের অতীত। সেইজন্যে আমি প্রাণপণে জপ করি, অপ্রমাদ! অপ্রমাদ! অপ্রমাদ!

শান্তিনিকেতন

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিজয়াদশমী, ১৩৬৭

অপ্রমাদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের সঙ্গে শেষ দেখা হয় প্রায় দু'বছর আগে। শীতের দুপুর। বাগানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে আলাপ করছিলুম আমরা। মাথার উপর ছত্র ধরেছিল তিনটি বিদেশী তরু। শুনতে পাই চেরি।

এর আগে আমরা এতটা অন্তরঙ্গ বোধ করিনি। তিনি তো আমাকে বার বার "তুমি" বলতে থাকলেন। আমিও দু' এক বার তাঁকে "তুমি" বলতে চেষ্টা করলুম। কথাবার্তার সবটা মনে নেই। মনে আছে তিনি তাঁর অরণ্যবিহারের বর্ণনা দিলেন। ঘাটশিলার কাছাকাছি সিংভূম জেলায় যেসব বনজঙ্গল আছে সেসব তাঁর দেখা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন, আট দশ দিন বনে জঙ্গলে ঘোরেন। আর কোনো জানোয়ারকে ভয় করেন না, করেন কেবল হাতীকে। হাতীর আক্রমণ থেকে গাছে উঠেও নিস্তার নেই। অরণ্যের যে বর্ণনা তিনি দিলেন তাতে তাঁর আরণ্যক অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া গেল। লোকালয়ের চেয়ে অরণ্যেই তিনি ভালো থাকেন। অন্তরের টান সেই দিকে।

যাবার সময় পরলোকের কথা উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাঁর "দেবযান" পড়েছি কি না। ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন আরো কয়েক বছর আগে। সেবার বলেছিলুম, পড়িনি। এবারেও সেই একই উত্তর দিতে হলো বলে লজ্জা বোধ করছিলুম। তিনি অনুরোধ করলেন পড়ে দেখতে। সেবারেও অনুরোধ করেছিলেন। সেবার আমরা তিন জনে বসে গল্প করছিলুম আমাদের উভয়ের বন্ধু মণীন্দ্রলাল বসুর বাড়ী। কথায় কথায় পরলোকের কথা উঠল। আমি বললুম, পরলোকে যাবার আগে কেউ পরলোকের কথা জানতে পারে না। আজ বাদে কাল কী হবে তাই জানবার উপায় নেই। পরকালের কথা

জানবে কী করে? জানতে চেষ্টা করা নিরর্থক। মণিদা আমার কথা সমর্থন করলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ বললেন, মানুষ ইচ্ছা করলে ভগবানকে পর্যন্ত জানতে পারে। পরকাল কি তাঁর চেয়ে বড়! সাধনা করলে সবই জানা যায়। আমার "দেবযান" পড়েছ?

আমার মনে হয় অরণ্যের মতো পরলোকের প্রতিও তাঁর অন্তরের টান ছিল। সেই টানই তাঁকে অকালে টেনে নিয়ে গেল। পরকালের কথা জানতে চেষ্টা করা নিরর্থক বলেছি। বলা উচিত ছিল বিপজ্জনক। সম্ভবত এর জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পুত্রকামনা পরিতৃপ্ত হবার পর জীবনে বোধ হয় তাঁর আর কোনো কামনা ছিল না। যার কামনা নেই সে সংসারে থেকেও অন্যমনস্ক। অন্যমনস্কতার ছাপ তাঁর রচনায় বহু দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। এখন তিনি আমাদের জগৎ থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছিলেন। আগে বুঝতে পারিনি।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের হলেও সাক্ষাৎ অনেক বার ঘটেনি। যে কয় বার ঘটেছে প্রত্যেক বার লক্ষ্য করেছি তিনি অতি সহজেই পরকে আপন করতে পারেন। এই দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে ঘরে ঘরে বান্ধবের আসন দিয়েছিল। তাঁর তিরোধান আমার মতো বহু জনের বান্ধববিয়োগ। সংবাদটা প্রথমে আমাকে হতবাক করেছিল। বিশ্বাস করতে পারিনি যে তিনি চলে গেছেন, আর দেখা হবে না। এখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছি, কেই বা এখানে থাকতে এসেছে! আমরাই বা ক'দিন থাকব! সুতরাং শোক করব না। যে কীর্তি তিনি রেখে গেছেন তা আমাদের অনেকের সাধ্যাতীত। বাংলা উপন্যাসের সব চেয়ে ছোট একটা তালিকা করলেও "পথের পাঁচালী"কে বাদ দেওয়া অসম্ভব। দশখানার মধ্যে একখানা তো বটেই, পাঁচখানার মধ্যেও একখানা। "পথের পাঁচালী" তাঁর ভিতরকার আসল মানুষটিকে মরণাতীত করবে। দেশ যখন আমাদের অনেকের

নাম ভুলে যাবে তখনো তাঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকবে অগণিত পাঠকের চিত্তপটে।

মৃত্যু তাঁকে আরেক জগতের দ্বার খুলে দিল। সে জগতে প্রবেশ করে তাঁর নতুন এক পথের পাঁচালী শুরু হলো। তাঁর নব জীবনের প্রাতে আমরা তাঁর শুভকামনা করব।

১৯৫১

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা

(জনাব মাহবুব-উল আলম সাহেবকে লিখিত পত্রাবলী)

॥ ১ ॥

কলকাতা এসে আপনার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটল তা প্রকাশ করে আপনি ভালোই করেছেন। এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দশ বিশ বছর পরে এটা আমাদের কাজে লাগবে। আপাতত এ নিয়ে আমরা বিশেষ কিছু করতে পারছিনে। কারণ যেসব বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাদের সমবেত শক্তি আমাদের শক্তির চেয়ে বেশী। তারা সমবেত নয় বলেই আমাদের রক্ষা। কোনো ক্রমে আমরা আমাদের নীতি রক্ষা করে যেতে পারছি, প্রাণটা যে আছে এটাও বিধাতার করুণা। আমাকে তো কুকুরের মতো গুলি করে মারার ভয় দেখানো হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর মতো। জবাহরলালের মাথার উপর খড়্গ ঝুলছে সেই সময় থেকে। তাঁকে তাঁর আসন থেকে টলাবার জন্যেও কম চেষ্টা হয়নি। তিনি যে অটল রয়েছেন এ শুধু তাঁর অসাধারণ মনের জোর ও দৈহিক সাহসের দৌলতে।

আপনার ছোঁয়া লেগে জল অপবিত্র হলো ১৯৫১ সালের কলকাতায়, এটা এত বড় একটা লজ্জার কথা যে আপনাকে আমি কী বলে সান্ত্বনা দেব জানিনে। তবে এটা আপনি বিশ্বাস করলে সুখী হব যে যারা এ কাজ করেছে তারা ভেবেচিন্তে করেনি, করেছে অন্ধ সংস্কার বশে। এবং ঠিক এই কাজটি করত যদি আপনার নাম হতো অন্নদাশঙ্কর রায় ও জায়গাটা হতো পাড়া গাঁ। আপনি আপনার বাল্যকালের যেসব ঘটনা বিবৃত করেছেন সেগুলিও খাটত যে কোনো হিন্দুর বেলা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ নিজে বসলেন ঘরের ভিতর, তাঁকে বসালেন চৌকাঠের বাইরে। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছোট ছোট দুটি মেয়ের ছোঁয়া লেগে একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর অন্ন অপবিত্র হলো, তিনি খেতে খেতে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। আমার পিতৃশ্রাদ্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন না। এমনি অনেক ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। এখনো কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার জানাতে ভুলে যান বা দ্বিধা বোধ করেন। একজন তো খোলাখুলি লিখলেন যে তাতে আমার অকল্যাণ হতে পারে, যদিও আমি নমস্কারের যোগ্য। হাঁ, ১৯৫১ সালে।

এসব সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ বদলে যাচ্ছে ও আপনি নিজেই তার সাক্ষী। একই বাড়ীতে হিন্দু মুসলমান বাস করছে, একই কল-ঘরে আনাগোনা করছে আগেকার দিনে এটা কল্পনাও করা যেত না। পরিবর্তনের স্রোত দিন দিন আরো প্রবল হবে তার সমস্ত লক্ষণ আজ স্পষ্ট। যে অঞ্চলে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা কড়াক্কড় সব চেয়ে বেশী সেই অঞ্চলটাই ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। এবারকার নির্বাচনে হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন কাদের জিতিয়ে দিচ্ছে লক্ষ্য করছেন কি? কাজেই অনেক বছর আগে হিন্দু সমাজ কী ভাবে আপনাকে বা হিন্দুদের বহুসংখ্যককে অপমান করেছিল সে সব

পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে ফল নেই। অতীতকে আমরা পিছনে রেখে এসেছি। সামনের দিকে মুখ করে পথ চলতে হবে। সামনের কথাই ভাবা যাক।

আমরা ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রের নাম রাখতে পারতুম হিন্দুস্তান। কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমাদের হয় নি। আমাদের নেতারা ষাট বছরের সংগ্রামের ফলে যা পেয়েছেন তা সকলের সাহায্যে পেয়েছেন। ষাট বছরের সংগ্রামে যোগ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান পার্শী শিখ। সকলের সংগ্রামের ফলে যা পাওয়া গেল তা সকলের পাওনা। আর সবাইকে বঞ্চিত করে হিন্দু যদি একাই সবটা গ্রাস করে তা হলে ধর্মে সইবে না। আমরা আমাদের সহযোদ্ধাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনি। করতে চাইনি। আমরা বেইমান নই। সেইজন্যে এত বড় একটা সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমরা আমাদের রাষ্ট্রের নাম রাখিনি হিন্দুস্তান। সাবেক নাম ইণ্ডিয়া বহাল আছে। তার অনুবাদ আগের মতো ভারত। আমাদের সঙ্গে আপনাদের তুলনা করে দেখুন। আপনাদের রাষ্ট্রের নাম রেখেছেন পাকিস্তান। সেখানে কেবল "পাক"দের স্থান। "না-পাক"দের স্থান নেই। "না-পাক"রা যদি সেখানে থাকে তবে "জিম্মী" হয়ে থাকবে। এই তাদের চিরকালের বরাত। এ বরাত দশ বিশ বছরেও ফিরবে না। কারণ দশ বিশ বছর পরেও রাষ্ট্রের নাম থাকবে পাকিস্তান, তারা থাকবে "না-পাক" ও সেই অপরাধে "জিম্মী", যদি না তারা ইসলাম কবুল করে। সব চেয়ে দুঃখের কথা আপনারা পূর্ববঙ্গের মানচিত্র থেকে বঙ্গ কথাটাই মুছে ফেললেন। শুধু মানচিত্র থেকে নয়। মন থেকেও। আপনার প্রবন্ধ পড়ে আমার ধারণা হলো আপনি বাঙালীই নন। আপনি বলছেন বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষাও খণ্ডিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাংলা দেশের বিরাট

মুসলমান সমাজকে ও তার এজমালি ভাষাকে ভেঙে দু'টুকরো করা হয়ে গেছে। মৌলানা আকরম খাঁর সমাজ ও জনাব খয়রুল আনাম খাঁর সমাজ এক নয়, তাঁদের মুখের ভাষা পর্যন্ত আলাদা। অদ্ভুত স্বজাতিপ্রেম, কিন্তুত স্বভাষাপ্রেম। আমার তো মনে হয় এও এক প্রকার অস্পৃশ্যতা। হিন্দু সমাজ থেকে ও জিনিস উঠে যাচ্ছে ও পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে আশ্রয় নিচ্ছে। আমরা "না-পাক", আমাদের ভাষা "না-পাক", এর পরে শুনতে পাব আমাদের নদী নালাগুলো "না-পাক" হয়ে গেছে। রাজশাহীর কাছে বাঁধ দিয়ে পদ্মার জল বন্ধ করতে হবে, বাহাদুরাবাদের কাছে বাঁধ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে আটক করতে হবে। তাদের জল অপবিত্র। হিন্দু পানি, মুসলমান পানি, হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট রুম, মুসলমান রিফ্রেশমেণ্ট রুম। এসব আমরা রেল স্টেশন থেকে উঠিয়ে দিয়েছি। আপনারা বোধহয় পাহাড় পর্বতের গায়ে খোদাই করে রাখবেন।

কিন্তু তা হলে আপনার ও আমার মেলবার জায়গা কোথায়! কমন গ্রাউণ্ড কোন্‌খানে? আপনার ধর্ম ও আমার ধর্ম এক নয়। আপনার রাষ্ট্র ও আমার রাষ্ট্র পৃথক। আপনার জাতি ও আমার জাতি—জাতি অর্থ এখানে নেশন—তো দুই স্বয়ং কায়েদ আজম সে কথা ডাইরেক্ট্ অ্যাকশনের দ্বারা সমঝিয়ে দিয়ে গেছেন। বাদ বাকী ছিল ভাষা। অন্তত ঐ একটা ডাল ছিল যেখানে আপনি ও আমি বসেছিলুম! সে ডালটাও কাটা গেল। নিতান্ত ব্যক্তিগত বন্ধুতার বাইরে আপনার ও আমার পায়ের তলায় মাটি কি একটুও অবশিষ্ট নেই! পূর্ব পাকিস্তানে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। তা হলে কি বুঝব ওখানকার তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের সঙ্গে আমার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই? ভুটিয়াদের মতো, তিব্বতীদের মতো ওরা আমার প্রতিবেশী ভিন্ন আর কিছু নয়? কাজী সাহেবের তবু

একটু সান্ত্বনা আছে। তিনি ওদের ধর্ম ভাই। আমার বুঝি সেটুকুও নেই! আমি ওদের মানুষ ভাই! হা হা হা হা!

কবে যে আমাদের মনের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে জানিনে। যেদিন আসবে সেদিন দেখবেন এসব ধারণার কুয়াশা কোথায় মিলিয়ে গেছে। যাঁকে জিন্নাহ্ সাহেব বলে জানেন তাঁর আসল নাম কী জানেন? মোহাম্মদআলী ঝীণাভাই খোজানী। বিলেত গিয়ে তিনি "ভাই" "খোজানী" বাদ দিলেন। পিতৃনাম "ঝীণা" হলো তাঁর পদবী "জিনা"। ইংরাজীতে সেকালে দেশী নামগুলো বিদেশী ছাঁদে লেখা হতো। যেমন "ঠাকুর" হলেন "টেগোর" তেমনি "জিনা" হলেন "জিন্নাহ্"। এটি একটি গুজরাতী শব্দ। এর মানে "ছোট।" তাঁর সম্প্রদায়ের নাম কী, জানেন? ইসমাইলিয়া শিয়া। ইসমাইলিয়া শিয়াদের উত্তরাধিকার কোন্ আইন অনুসারে শাসিত জানেন? হিন্দু আইন। অন্তত কিছু দিন আগেও তাই ছিল। দু'পুরুষ পূর্বেও এঁদের নামধাম সব হিন্দু ছিল। আইনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক দিন নজরে পড়ল— "The term 'Hindu' includes 'Ismailia Khojas". এটা ১৯১৫ কি ১৬ সালের আইন। তার একটু পরে ঝীণা সাহেব বিবাহ করেন পার্শী রতনপ্রিয়া পেতিতকে। পার্শীরাও হিন্দু নাম পছন্দ করে দেখছেন? রতনপ্রিয়া যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে ঝীণা এত দূর যেতেন না। মার্কিন মহিলা মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট তাঁর "Half-way to Freedom"গ্রন্থে একথা লিখেছেন।···

শান্তিনিকেতন, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫২

॥ ২ ॥

আপনার চিঠি, আপনার "আকাশ, মাটি ও সময়" ও আপনার পুত্রের "নন্দন কাননে দুটি পারিজাত" পেয়ে সত্যি খুব আনন্দ হলো।

প্রথমেই আপনাকে সাধুবাদ দিই ও অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন করি আপনার অন্যতম বৃহৎ জয়ের জন্যে। হিন্দু মুসলমানের জাতি বিরোধের অন্ধকার অরণ্যপথে দীপ হাতে করে চলেছেন যে দু'চার জন দুঃসাহসী আপনি তাঁদের এক জন। এর জন্যে তো আপনাকে দুঃখ পেতে হবেই। কিন্তু আমার অনুরোধ শুধু এই যে আপনিও যেন পাল্টা দুঃখ না দেন। আপনার এই রচনাটি যদি আগে পাঠাতেন তা হলে তো আপনাকে ভুল বোঝার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না।

"কলিকাতায়" পড়ে প্রথমাংশে আপনার প্রতি সমবেদনা জাগে কিন্তু দ্বিতীয়াংশ পড়ে যা জাগে তা সেই পুরাতন জ্বালা যাকে ভুলতে আমরা এত কাল চেষ্টা করে আসছি। আপনার পুত্রকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন, আর যদি আপত্তি না থাকে তবে আশীর্বাদ। তার জীবন আরম্ভ হয়েছে কল্যাণ-ব্রতে, মহাকল্যাণ প্রসূ হবে তার লেখনী।

আপনার চিঠি লেখার পরে প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওই নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন তখন তিনি আলাদা একটা ঘরে তাঁর খাবার নিয়ে খেতে বসতেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন তাঁর সহপাঠী। আলী অনুযোগ করলে তিনি বলতেন, আমি যে তোমাকে ভালোবাসিনে তা নয়, কিন্তু এটা আমাদের প্রথা। আমাদের মায়েরাও ছেলেদের সঙ্গে খান না। তা বলে কি ছেলেরা অস্পৃশ্য? এর উত্তরে আলী বলেন, যে দিন আমাকে মা'র মতো ভালোবাসবে সেদিন ওকথা বলবে। এর কিছু দিন পরে প্রভাতবাবুর ছোঁয়া লেগে যায় এখানকার এক মৈথিল ব্রাহ্মণের গায়ে। তিনি তাঁর খাওয়া বন্ধ করে উঠে হাত ধুলেন। প্রভাতবাবু বললেন, আমি সদাচারী ব্রাহ্মণ, উচ্চ বংশীয়। আমি মাছ পর্যন্ত খাইনে, আপনি তাও খান। কেন তা হলে আপনি আপনার খাওয়া ছেড়ে উঠলেন? মৈথিল ব্রাহ্মণ বললেন, ওটা

আমাদের প্রথা। তখন প্রভাতমোহনের জ্ঞান হলো। তিনি সকলের সঙ্গে খেতে শুরু করলেন। পরে যখন সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আন্দোলন হয় তখন মুসলমান চাষীর বাড়ী দু'মাস ছিলেন, খাওয়া দাওয়া ওদের সঙ্গে চলত।

সকলে কিছু প্রভাতমোহন নন, তিনি যত সহজে শিখলেন সকলে কিছু অত সহজে শিখবে না। এ আপদ কত কাল স্থায়ী হবে কেউ জানে না। তবে এক সঙ্গে আমাদের শত্রু সম্পর্ক। অর্থাৎ একে আমরা প্রশ্রয় দেব না, উচ্ছেদ করবই। আমার ডায়েরির মলাটে লেখা আছে, Godse first. এর মানে আগে গোড়সেকে হারাতে হবে। চার্চিল যেমন বলতেন, হিটলার ফার্স্ট। আগে হিটলারকে হারাতে হবে। গান্ধীকে যে শক্তি হত্যা করেছে সে একটি ব্যক্তি নয়। সে আমাদের সমবেত গোঁড়ামির দু' হাজার বছরের বদ্ধমূল অন্যায়। আজকের কাগজেই দেখলুম তার বিরুদ্ধে মাদ্রাজের নন্‌কংগ্রেস ফ্রণ্ট প্রস্তাব পাস করেছে। ওদের হাতে যদি ক্ষমতা আসে ওরা জাতের অত্যাচার কড়া হাতে দমন করবে। এর ফলে কংগ্রেসের যদি সুমতি হয় কংগ্রেসও তাই করবে। কেবল রাজনীতি করব, সমাজের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করব না, এ নীতি স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত নয়। সমাজেও হস্তক্ষেপ করতে হবে। তা করতে গিয়ে হয়তো আরো কয়েকটা গান্ধীহত্যা ঘটবে। কিন্তু তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। গোড়সে ফার্স্ট। যে শক্তি গান্ধীর মতো মহাত্মা পুরুষের প্রাণ নাশ করেছে তার প্রতি আমার লেশমাত্র মমতা নেই। মমতা এখানে দুর্বলতা। গত চার বছর ধরে আমি এই নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি। কাকে বোঝাব বেদনা! কে বুঝবে! কাজী সাহেব জানেন।

এ কাজ হিন্দুর কাজ। আমি যদি নিজেকে অহিন্দু মনে করতুম তা হলে এত কষ্ট পেতুম না। আমি হিন্দু বলেই আমার এত মাথাব্যথা।

যদি কোনো দিন গোড়সেকে হারাতে পারি তা হলে আপনি হিন্দুর কাছে যে আঘাত পেয়েছেন সে রকম কোনো আঘাত পাবেন না। হিন্দু সম্বন্ধে আপনার ধারণা বদলাবে। হিন্দু বলতে আপনি যদি একটা অপরিবর্তনীয় প্রাগ্‌ঐতিহাসিক প্রাণী বুঝে থাকেন তা হলে ভুল বুঝেছেন। হিন্দু দিন দিন বদলে যাচ্ছে। এই চার পাঁচ বছরেও অনেক বদল হয়েছে। এবারকার নির্বাচনে গোঁড়া হিন্দুর দল হেরে গেছে। বহু স্থলে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আশা করি এর পরে তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আসবে না। সমাজে অবশ্য তারাই প্রবল এখনো। সমাজ থেকেও তাদের হটাতে হবে। জনমত ধীরে ধীরে সেই দিকে যাচ্ছে। ধৈর্য ধরতে হবে। আমি স্থির করেছি যে আমাদের নেতারা জাতিভেদ তুলে দেবার জন্যে প্রাণপণ না করা পর্যন্ত আমি নাগরিকতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কিছু লিখব না। কেননা দেশের বর্তমান অবস্থায় গ্রামে ফিরে কুটিরশিল্পের চর্চা করলে জাতিভেদ আবার দানা বাঁধবে। আমি দশ বছর অপেক্ষা করব। তত দিন জাতিভেদের বিরুদ্ধে নাগরিকতা ও যান্ত্রিকতা কাজ করতে থাকবে। তাদের শক্তি জাতিভেদের চেয়ে অস্পৃশ্যতার চেয়ে বেশী। তবে তাদের পেষণে পল্লীর ক্ষতি হবে। আগে আমি পল্লীর কথা যত বেশী ভেবেছি পল্লীসমাজের কথা তত বেশী ভাবিনি। পল্লীসমাজকে বর্তমান অবস্থায় রেখে পল্লীর উন্নতির কথা ভাবা ভুল। কেননা এর মধ্যে গোঁড়ামির বীজ নিহিত রয়েছে। গোঁড়ামিকে উচ্ছেদ করতে হবে। গোড়সে ফার্স্ট। তারপরে আসবে গান্ধীর যুগ। তার জন্যে আমি দশ বছর সময় দিচ্ছি।

এবার যদি আপনার আপত্তি না থাকে পাকিস্তানের কথা বলি। আপনার "আকাশ, মাটি ও সময়" যে ধারার নির্দেশ দিচ্ছে সেই ধারাই প্রকৃত ধারা। "কলিকাতায়" সে ধারা থেকে সরে গেছে। সেক্যুলার স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, রাজনীতিকে ধর্মের তাঁবেদারি থেকে মুক্ত

করতে হবে, গোঁড়ার দলকে প্রথমে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে হটাতে হবে। কায়দে আজম গোঁড়া ছিলেন না। মরহুম লিয়াকৎ আলি সাহেবও গোঁড়া ছিলেন না। এখানে আমি তাঁর আত্মার জন্যে আমার প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করি। যেদিন সেই শোচনীয় হত্যার সংবাদ কানে এলো সেদিন আমি যা লিখেছিলুম তা নিচে উদ্ধৃত হলো।

"ভাই যদি অরি হয় তা হলেও তার শোক
বাজে বুকে—আত্মার বন্ধন ক্ষয় হোক।"

আপনারা যদি রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করতে পারেন, গোঁড়ার দলকে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে সরাতে পারেন তা হলে যা হবে তারই নাম সেক্যুলার স্টেট। কাজটা কম কঠিন নয়। আমরা চার বছর কাল অবিরত চেষ্টা করার পর এই সম্প্রতি গোঁড়ার দলকে রাজনীতি থেকে হটাতে পেরেছি। জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট না হলে কখনো এটা সম্ভব হতো না। মুসলমানরা ভোট না দিলে বহু স্থলেই কংগ্রেস প্রার্থী বা কমিউনিস্ট প্রার্থীর হার হতো। মুসলমানের ভোট বহু স্থলেই কংগ্রেসকে কমিউনিস্টকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যে সকল অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা কম সে সকল স্থানে সাম্প্রদায়িক হিন্দুর দল জিতেছে। অবশ্য পশ্চিম বঙ্গের কথা বলছি। পূর্ব পাকিস্তানে কবে নির্বাচন হবে জানিনে। যখন হবে তখন এ শিক্ষা হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে। জয়েণ্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তিত না হলে গোঁড়ার দলকে হটানো সম্ভবপর মনে হচ্ছে না। গোঁড়ার দলকে হটাতে হলে হিন্দুর ভোট কাজে লাগবে। জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট না হলে হিন্দুর ভোট আপনাদের কাজে লাগবে না। লাগবে হিন্দুদের নিজেদের কাজে। পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি নিজেদের নিয়েই থাকে তা হলে যে তাদের ভিতর থেকে জাতিভেদ দূর হবে তা নয়। জাতিভেদ দূর করতে হলে যে পরিমাণ মনের প্রসার চাই সেটা আসে একটা

বিরোধের ভাব থেকে। পাকিস্তানের হিন্দুরা এখন সংখ্যালঘু। তারা নিজেদের গোঁড়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের সংহতি দুর্বল করবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো সাহস বা সামর্থ্য তাদের নেই। যদি কোনো দিন তাদের মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো কোনো সংস্কারক জন্মান তিনি যে কেবল নিজের সমাজের গোঁড়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন তা নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াবেন। সেটা তো আপনারা চান না। তার চেয়ে অনেক ভালো হবে যদি জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট প্রবর্তিত হয়, হিন্দুরা মুসলমানদের ভোট দেয়, মুসলমানরা গোঁড়াদের হটায়। এক পক্ষের গোঁড়ার দল হটলে অপর পক্ষের গোঁড়াদের বিরুদ্ধে কাজ করার লোক পাওয়া যাবে। মুসলমানরাই ভোট দিয়ে সাহায্য করবে হিন্দু সংস্কারপন্থীদের। জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট এইজন্যে চাই।

শান্তিনিকেতন, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

॥ ৩ ॥

ঢাকার খবর পেয়ে মন খুব খারাপ। আশা করি বদরুল এর মধ্যে নেই। তা হলেও আপনার দুর্ভাবনা—আপনার মতো বহু পিতামাতার দুর্ভাবনা আমাকেও দুর্ভাবনায় ফেলেছে। যারা গেল তাদের জন্য আমিও পুত্রশোক অনুভব করছি। আমরা যে পরস্পরের আত্মীয় তা এইসব সঙ্কটের দিন কাউকে বলে দিতে হয় না। মন আপনি হু হু করে, চোখ আপনি ছল ছল করে। ইচ্ছে করে গিয়ে সমবেদনা জানাতে সান্ত্বনা দিতে।

মৃত্যুর মধ্যে তরুণের মৃত্যু, তরুণীর মৃত্যু, যেমন tragic তেমন আর কোনো মৃত্যু নয়। তবে তা heroic—এই যা সান্ত্বনা ও গৌরব। ওরা জয়ী হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার। প্রথম দিকের সংবাদ পড়েই ডায়রীতে লিখেছিলুম—

"প্রাণ দিল যারা ভাষার জন্যে
জয় কি হবে না তাদের ?
জয় যে তাদের হয়েই রয়েছে
জনতা পক্ষে যাদের।"

আমাদের এখানকার অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহাকে ঢাকার এক মুসলমান অধ্যাপক বলেছিলেন অনেক দিন আগে, "দেশের জন্যে হিন্দুর ছেলেরা রক্ত দিয়েছে। ভাষার জন্যে মুসলমানের ছেলেরা রক্ত দেবে, দেখবেন।"—সত্য হলো।

শান্তিনিকেতন, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

॥ ৪ ॥

…হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্য এক আধ পুরুষের নয়, প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক মুসলমান জীবনে একটা না একটা আঘাত পেয়েছেন প্রতিবেশী সমাজের কারো না কারো কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে আসছে, কেউ কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে হিন্দু বাস করবে "হিন্দুস্থানে", মুসলমান বাস করবে মুসলমানস্তানে (বা "পাকিস্তানে"), কেউ কারো প্রতিবেশী হবে না। এই যে কল্পনা এটা আপনার ও আমার জীবনে এসেছে ১৯৩৮ সালের পরে (যখন আমরা চট্টগ্রামে ছিলুম)। আপনি ঠিক কবে এর দ্বারা সম্মোহিত হলেন আমার জানা নেই, বোধ হয় ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহের পরে। আমি কোনো দিনই এর দ্বারা সম্মোহিত হইনি, তবে আমিও ভারত বিভাগ বঙ্গবিভাগ মেনে নিয়েছি ১৯৪৭ সালে। দেশবিভাগ মেনে নিয়েছি বলে কিন্তু লোক বিনিময় মেনে নিইনি। অর্থাৎ আমি প্রতিবেশীকে ভিন্ন রাষ্ট্রে বিতাড়ন করি নি, করতে দিইনি, করা সমর্থন করিনি, করার প্রতিবাদ করেছি,

এর জন্য কিছু দুর্ভোগ সয়েছিও। আপনিও বিতাড়ন করেননি, করতে দেননি, সমর্থন করেননি, প্রতিবাদ করেছেন, দুর্ভোগ সয়েছেনও।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে হিন্দু থাকছে মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্তানে, মুসলমান থাকছে হিন্দুর সহিত ইণ্ডিয়া তথা ভারতে ("হিন্দুস্থান" আমরা স্বীকার করিনি)। এখন কথা হলো এদের থাকাটা কি এদের প্রতিবেশীরা অন্তরের সঙ্গে চায়? তা যদি চাইত তবে লিয়াকৎ নেহরু চুক্তির আবশ্যক হতো না, এ চুক্তি প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর মিতালি নয়, আত্মীয়তা নয়, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত— যে কোনোদিন উল্টে যেতে পারে। কিসের উপর নির্ভর করে হিন্দু থাকবে ঢাকায়, মুসলমান থাকবে কলকাতায়? কে তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবে? কী তার সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ? কতটুকু তার অধিকার? এসব প্রশ্ন এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই জন্যে Constitution -এর প্রয়োজন হয়। তাতে Guarantees বা Entrenched Clauses থাকে। তাও যথেষ্ট নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমান শাসকদের মতি-গতি দেখে আশঙ্কা হয়। এটাই অন্তরের আকজ্ক্ষা যে হিন্দু থাকুক ঢাকায়, মুসলমান থাকুক কলকাতায়। এই আকাঙ্ক্ষার অন্য নাম প্রেম। যেখানে প্রেম নেই সেখানে বিয়ের মন্ত্র কোন কাজে লাগে? Constitutional Safeguardsও সেই রকম। তবু বিয়ের মন্ত্রেরও প্রয়োজন থাকে, Constitutional Safeguardsএরও আবশ্যক হয। আমাদের এখানে আমরা Constitution তৈরি করেছি এমন ভাবে যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এক সঙ্গে বাস করতে গেলে বিপন্ন হবে না, হলে রাষ্ট্র দায়ী হবে। আপনারা যদি ওটুকুও করতেন তা'হলেও কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ দেখছিনে। তার বদলে শুনে আসছি হিন্দুরা মুসলমানদের জিম্মী। এ সত্ত্বেও হিন্দু বাস করছে পাকিস্তানে, বাস করবে, কিন্তু সেটা হিন্দুর risk-এ, হিন্দুর right

এখনো সাব্যস্ত হয়নি। সে যেন উটবন্দী প্রজা। যখন ইচ্ছা উঠিয়ে দিলেও চলে। পাকিস্তানে থেকে হিন্দুকে uproot করা যত সহজ ভারত থেকে মুসলমানকে uproot করা তত সহজ নয়। আগামী দশ বারো বছরে এর প্রতিকার করতে হবে। অবশ্য যদি অন্তরের সঙ্গে চান যে হিন্দুরা পাকিস্তানে থাকে।

আমি একদিন আমার গৃহিণীকে বলছিলুম, আমার শেষ জীবন কাটাতে চাই কুষ্টিয়া জেলায়, বাংলা দেশের হৃদয় যেখানে। তার আগে তাঁকে বলেছিলুম প্রত্যেক বছর পূর্ববঙ্গে কিছু দিন বেড়িয়ে আসতে চাই সংযোগ রক্ষা করতে। কিন্তু আপনার "কলকাতায়" প্রবন্ধ পেয়ে ও আপনার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলুম যে আমার শেষ জীবনের পরিকল্পনাটা কবিকল্পনা। যে মুসলমানকে আমি রেখে এসেছি সে মুসলমান আর নেই, তার বদলে যে আছে সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, হিন্দুর বিরুদ্ধে তার যত কিছু অভিযোগ সব আমার কাঁধে চাপাবে। যেন আমিই এর জন্যে দায়ী। আমার শেষ জীবনের কুষ্টিয়াবাস তো ভেস্তে গেলোই, আমার বাৎসরিক পূর্ববঙ্গ ভ্রমণও মাটি হলো পাসপোর্ট প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে। নিজের দেশে আমি বিদেশীর মতো যাব না। কতদিন এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে দেখা যাক। মানুষের হিতাহিত বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। সে তার ভুল বুঝতে পারলে সংশোধন করে। তেমন একটা সংশোধনের জন্যে আমি সর্বকাল অপেক্ষা করব। কে জানে হয়তো সত্যি একদিন পূর্ববঙ্গে এমনি যাব ও পরে একদিন কুষ্টিয়া অঞ্চলে ডেরা বাঁধব। সেদিন নিকটে না দূরে তা নির্ভর করছে আপনাদের উপরে। অর্থাৎ next stepটা আপনাদের নিতে হবে। আপনারাই স্থির করবেন হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে শিকড় গেড়ে বসবে, না উটবন্দী প্রজার মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনারাই স্থির করবেন হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ ভ্রমণ করবে কি না।

বাংলাভাষা নিয়ে যে আন্দোলন চলছে সেটা আসলে "বাঙালী বনাম পশ্চিমা" আন্দোলন। বলতে পারি, "পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান" আন্দোলন। আন্দোলনে আপোসের একমাত্র উপায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে বহাল রাখা। কিন্তু ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হলে ইসলামী রাষ্ট্র কী করে সম্ভব? আর ইসলামী রাষ্ট্র যদি যায় তা হলে Secular State কি মোল্লা মৌলবীরা সমর্থন করবেন? আর মোল্লা মৌলবীরা যদি সমর্থন করেন তা হলে পাকিস্তান রাখার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো না কি? যা হোক, দেখে সুখী হচ্ছি ইংরেজীকে আরো বিশ পঁচিশ বছর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রাখা হবে। এই বিশ পঁচিশ বছরে পাকিস্তান Secularised হবে, Modernised হবে। বলা যেতে পারে তুরস্কের মতো হবে। তা যদি হয় তবে হিন্দুর পক্ষে পাকিস্তানী হওয়া সহজ হবে। অনেকের নিকট কথা বলে দেখেছি। তাঁরা বলেন, "পাকিস্তান যদি Secular State হয় তা হলে আমরা পাকিস্তানেই থাকব, আমরা ভারতে থাকব না। আমাদের ঘরবাড়ী সেখানে।"

দার্জিলিং এসেছি চুপচাপ ভাবতে, লিখতে, শরীর মন সারাতে। একটা ছোট উপন্যাস লিখছি। এটা শেষ করে একটা বড় উপন্যাসে হাত দেব। সেটা শেষ করতে সাত বছর লাগবে। এ সাত বছর আমি শান্তিনিকেতনে বাস করব। তার পরে বিশ্বভ্রমণের বাসনা আছে। ঘোরাফেরার পর কুষ্টিয়া অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে পারি, কিন্তু তার সম্ভাবনা এত কম যে শান্তিনিকেতনই আমার স্থায়ী আশ্রয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।......

দার্জিলিং, ৯ই মে ১৯৫২

॥ ৫ ॥

···চিঠিপত্র প্রকাশ করতে চান, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপাতত দু' এক বছর সবুর করলে ভালো হতো। পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার মন এখনো সম্পূর্ণ নির্মল হয়নি। Heart searching এখনো চলছে। তবে ক্রমশই আমি দেশ বিভাগের পক্ষপাতী হয়ে উঠছি ও তার পশ্চাতে বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখতে পাচ্ছি। অনেক সময় জীবনে এমন কিছু ঘটে যাকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ভগবানের মার। পাঁচ দশ বছর পরে মনে হয় বিধাতার আশীর্বাদ। এই তো সেদিন আপনাকে পাসপোর্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছি। এখন বুঝতে পারছি এ ব্যবস্থার ফল ভালো হবে। তেমনি দেশবিভাগ সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমে বদলে যাচ্ছে। আমি তার সুফল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হৃদয় অবুঝ। তার মান অভিমানের অন্ত নেই। তাকে বোঝাতে আরো দু'এক বছর লাগবে। সুতরাং অপেক্ষা করা যাক। ইতিমধ্যে চিঠিপত্র আরো লেখালেখি চলুক। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলি, আপনার বক্তব্য শুনি।······

দার্জিলিং, ১লা জুন ১৯৫২

॥ ৬ ॥

···আপনার চিঠি পাই যেদিন দার্জিলিং থেকে চলে আসছি। ট্রেনে বসে আপনার প্রবন্ধ ও গল্প পড়ে সময় কাটাই। আপনার হিন্দু বন্ধু-গণের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। আপনার গল্প আমার বরাবর ভালো লাগে তার এলিমেণ্টাল প্রকৃতির জন্যে। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাছে এইটেই আমার সর্বপ্রধান প্রত্যাশা। মাটির সঙ্গে জলের সঙ্গে তাঁদের যতখানি যোগ আমাদের ততখানি নয়। আমরা যা পারিনে আপনারা তা পারেন।

পূর্ববঙ্গে যে নতুন সাহিত্য জন্ম নেবে তার দিকে আমরা বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছি। আপনি তার একজন দিক্‌পাল ও দিশারী। আমার মতে আপনার চেয়ে বড় ওখানে আর কেউ নেই। আপনি যে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন ও বিচিত্র বিষয়ে লিখছেন, আপনার লেখায় যে আদর হচ্ছে এর জন্যে আমি খুব খুশি। "মোমেন"-এর ইংরেজী তর্জমা যদি সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তা হলে বেশ হয়। বাংলা সাহিত্যের জন্যে তারা অনেক কাজ করেছে ও করছে। এটুকু তাদের করা উচিত।

মনসুর উদ্দীন হঠাৎ আমাকে চিঠি লিখে বিলেতের জন্যে পরিচয় পত্র চাইলেন। তাড়াতাড়ি লিখে পাঠিয়ে দিলুম। যাবার আগে পেলেন কি না জানিনে। ওঁকে বললুম কিছু বাংলা রেকর্ড নিয়ে গিয়ে শোনাতে। আশা করি তাঁর যাত্রা সার্থক হবে। বাউলদের সম্বন্ধে শ্রীমতী লীলা রায় এই মুহূর্তে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি যাবে দিল্লীর "মার্চ অফ ইণ্ডিয়া" পত্রে। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি চমৎকার বাউল গানের তর্জমা আছে।

আমার আগের একখানি চিঠিতে লিখেছিলুম পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার মন সম্পূর্ণ নির্মল হয়নি, আরো দু' এক বছর লাগবে। ও চিঠি লেখার পর দিন রাত চিন্তা করেছি। ফলে আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই পাঁচ বছরে ভারত রাষ্ট্র যে অসামান্য উন্নতি করেছে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি বর্মার মতো গৃহযুদ্ধ লেগে থাকত বা পূর্বের মতো দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে থাকত। পাকিস্তান হওয়াতে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে পাকিস্তান না হলে তার চেয়ে আরো কঠিন সমস্যার ঝক্কি পোয়াতে হতো। যেমন মুসলমান ফৌজের মিউটিনি। পাকিস্তান মেনে নিয়ে আমরা আমাদের শক্তিকে সংহত না করলে দেশীয় রাজন্যরা এত সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দিত না। একরাশ দেশীয় রাজ্যকে নিয়ে

বিভ্রাট বাধত। নতুন কন্‌সটিটিউশন রচনা করাও কি এমন নিষ্কণ্টক হতো! পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি তুলে দিতে গেলে মুসলমানরা বিদ্রোহ করত। পাকিস্তানে চলে যাবার রাস্তা খুলে রেখে আমরা তাদের বিদ্রোহের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। পাকিস্তানের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল বলে পাকিস্তানে আমাদের আপত্তি ছিল। সে আশঙ্কা আর নেই। তার বৈদেশিক নীতি ভারতের বৈদেশিক নীতিবিরুদ্ধ হলে আশঙ্কায় কারণ ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান মোটের উপর একই বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে। এখন বাকী আছে মাত্র একটি মাত্র ক্ষোভ। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থা। এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সংখ্যালঘুদের অবস্থা। আর দু'এক বছরের মধ্যে এ বিষয়ে একটা স্থিরতার ভাব আসবে। পাসপোর্ট প্রবর্তনের পর মানুষ স্থির হয়ে এক জায়গায় বসবে। যার যেখানে মন বসে! হ্যাঁ, আমি এখন পাসপোর্টের পক্ষপাতী। ১৯৪৭ সালে যে অধ্যায় শুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে সে অধ্যায় আরো ভালো করে শুরু হবে। অর্থাৎ গল্প জমবে। হিন্দু মুসলিম সমস্যার সব রকম সমাধান পরখ করে দেখা গেছে, ফল হয়নি। এই সমাধানটা পরখ করে দেখা যাক। মিলনের আগ্রহ যদি আসে তবে এবার আসবে মুসলমানদের দিক থেকে, পাকিস্তানের দিক থেকে। আমরা জোর করব না, চাপ দেব না, চেষ্টা করব না, আগ্রহ দেখাব না, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আর কাজও কি কম আমাদের হাতে!

আমাদের এখানে আমরা "সেক্যুলার স্টেট"-এর আদর্শ গ্রহণ করেছি। এই আদর্শ উদযাপন করতে হবে। এর অর্থ কী তাই অনেকে বোঝে না। তাদের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে ছাপতে দিয়েছি "চতুরঙ্গ" ত্রৈমাসিক পত্রে। আরো দু' একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে মনে হচ্ছে। ভারত যদি তার নিজের আদর্শে দৃঢ় থাকে তা হলে ভারতের অবস্থার

এত বেশী উন্নতি হবে যে পাকিস্তানের জনমত ক্রমেই ভারতের অনুরাগী হবে। যেমন ভারতের জনমত আজ ইংলণ্ডের অনুরাগী। অথচ এই তো সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া লেগে রয়েছিল। তেমনি ভারতের সঙ্গে আপনাদের মনোমালিন্য থাকবে না, জাগবে তার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা, তার আদর্শের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস। ধীরে ধীরে আপনারাও মেনে নেবেন সেক্যুলার স্টেটের আদর্শ। ইতি-মধ্যেই তার সূচনা দেখছি আইনে আদালতে। পরে দেখব কন্‌সটি-টিউশনে, পার্লামেণ্টে, গভর্ণমেণ্টে। হতাশ হবার কারণ নেই, তবে ধৈর্য ধরতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে নিজের এলাকায় নিজের আদর্শ অনুযায়ী কাজ। এই পাঁচ বছরে অনেকটা সফল হওয়া গেছে। কিন্তু এখনও বহু লোক আছে যারা হাড়ে হাড়ে কমিউনাল এবং তাদের বেশীর ভাগ হিন্দু। তবে ভারতের জনগণ তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো অধ্যায়ের কথা কেউ মনে রাখতে চায় না। কবে কোন মুসলমান কী অন্যায় করেছিল তা কারও স্মরণ নেই। স্মরণ থাকলেও তা নিয়ে কেউ প্রতিহিংসা পোষণ করে না। তবে পাকিস্তানে কিছু ঘটলে তার সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথা তোলে। কিংবা হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে মুসলমানের ছেলের বিয়ে হচ্ছে শুনলে অনর্থ বাধায়। এর জন্যে আমরা দুঃখিত। এ মনোভাব তাদের মধ্যেই বেশী যারা সর্বস্বান্ত হয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে, যাদের মেয়েদের ইজ্জৎ গেছে, যাদের ছেলেরা খুন হয়েছে। এটাকে আপনি সারা হিন্দু সমাজের মনোভাব বলে ভুল করবেন না। সে রকম মনোভাব যদি থাকতো কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতিথি উৎসব কী করে সম্ভব হতো? আর টাকাও তো বড় কম উঠছে না তাঁর চিকিৎসার জন্যে। এবার যেন একটু আশা দেখা যাচ্ছে আরোগ্যের।

জনগণকে আমি হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে বিভক্ত করার বিপক্ষে। কোনোদিন এ ভেদবুদ্ধি আমার ছিল না, কোনো দিন হবে না। তবে সমাজ যে এক নয়, দুই, এটা জাগ্রত সত্য। এর থেকে এসেছে একাধিক রাষ্ট্র। সমাজ যাতে এক হয় সে কথাও ভেবেছি। যখন ছাত্র ছিলুম তখন থেকে ভেবে আসছি অন্তর্বিবাহের কথা। আপনার কাছে একরার করছি যে এক মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করার কল্পনা আমার মনে উদয় হয়েছিল। তখন আমি লণ্ডনে। সেটা একজনেরই কল্পনা। আরেক জনের নয়। সমাজ এক নয়, দুই সমাজের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান, তবু এ ধরনের বিবাহ অনেকগুলি হয়েছে, আরো হবে। কিন্তু সমস্ত খণ্ডন সত্ত্বেও জনগণ এক ও অবিভক্ত। দেশ ভাগ হয়েছে বলে জনগণ ভাগ হয়েছে এ ধারণা আমি পোষণ করিনে। তবে জনগণের কতক অংশ পাগল হয়েছে এটা জাজ্বল্যমান সত্য। পাগলামি চিরদিন থাকবে না। হিন্দু মুসলমানকে ছেড়ে, মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে কোনো অর্থেই লাভবান হতে পারে না। জীবন থেকে স্বাদ চলে যাবে, সমৃদ্ধি চলে যাবে, যদি মুসলমান কেবল মুসলমানকেই দু'বেলা দেখে, হিন্দুকে চোখে দেখতে না পায়। অথবা হিন্দু যদি কেবল হিন্দুকে নিয়েই বারো মাস থাকে, মুসলমানের সঙ্গ না পায়। হাজার বছর ধরে আমরা পরস্পরকে ধনবান করেছি, তার সাক্ষী আমাদের সঙ্গীত, আমাদের সাহিত্য, এমন কি আমাদের রন্ধনকলা। হাঁ, মারামারিও করেছি, কিন্তু ভালোবাসাবাসিও কি করিনি? আমাদের জীবনযাত্রার প্যাটার্ন এ রকম যে কেউ কাউকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না, বাঁচলেও হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ কেউ কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, রোজ ঝগড়া করবে। আচ্ছা দেশ রে, বাবা! বাইরে থেকে যারা দেখে তারা আমাদের হৃদয়টা দেখতে পায় না। সেখানে প্রেমের পরিমাণ প্রচুর। সব চেয়ে গোঁড়া মুসলমান ও সব চেয়ে গোঁড়া হিন্দুর মধ্যেও। আর

যাঁরা গাইয়ে বাজিয়ে আঁকিয়ে লিখিয়ে ফকির দরবেশ বাউল সন্ত তাঁদের হৃদয়ে প্রেম ছাড়া কী আছে! যতই রাগ করি আর যতই যাই করি ভালো না বেসে থাকতে পারি কই!

শান্তিনিকেতন, ২০শে জুলাই ১৯৫২

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আলাপ বেশী দিনের নয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁর সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তা বহু দিনের পরিচয় সত্ত্বেও বহু জনের সঙ্গে সম্ভব হয় নি। অথচ এই মিত্রতার গোড়ার দিকটা শত্রুভাবের কাছাকাছি যায়। সে এক মজার গল্প।

দেশবিভাগের কয়েক মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদের সীমান্তে যে অশান্তি ধোঁয়াতে থাকে তার দরুন এক সময় আমাদের সৈন্য চলাচলের কথা ভাবতে হয়। সৈন্য এলে মাথা গুঁজবে কোথায়? বহরমপুরের এক প্রান্তে কাশিমবাজার মহারাজার একটা বাড়ী খালি পড়েছিল, বে-মেরামত অবস্থায়। আর কেউ সে বাড়ী ভাড়া নিত না, গবর্নমেণ্টের তরফ থেকে আমরাই দখল করি ও ন্যায্য ভাড়া ঠিক করে দিই। এ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এলেন তাঁর কর্মচারীবৃন্দ। আমি তাঁদের দেশাত্মবোধ কম দেখে মহাবিরক্ত হই। তাঁরা চলে গেলে পর কে যেন আমাকে বললেন ঐ যে শুকনো ঝুনো পোড়খাওয়া কালো মানুষটি উনি কাশিমবাজারের ইঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, উনি একজন কবি।

আরে! উনি! আমি চমকে উঠলুম। একজন কবি নয়, একজন মস্ত বড় কবি, যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, যাঁকে শ্রদ্ধা দেখাতে চাই, সেই

মানুষ এসেছিলেন আমার খাস কামরায়, আমি চিনতে পারিনি, কড়া ব্যবহার করেছি। অনুশোচনায় মন ভরে গেল। পরে আমার নির্ধারণ পরিবর্তন করেছিলুম।

কবির সঙ্গে সাহিত্যিকের সত্যিকার পরিচয় হলো একটি অনুষ্ঠানে। সেটি তাঁরই পাড়ায়। বোধ হয় তাঁরই বাড়ীতে। পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হলো। একদিন তিনি আমাদের ক্লাবে এসে পড়ে শোনালেন তাঁর প্রবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয় তাঁর কবিবন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচী। বাগচী ছিলেন বয়সে পদমর্যাদায় আভিজাত্যে সেনগুপ্তের চেয়ে বড়, কিন্তু এমনি দরাজ তাঁর হৃদয় যে আপনি এসে বাড়ীতে দেখা করে মিতালি পাতিয়েছিলেন প্রথম দিকে যখন সেনগুপ্তের নাম বিশেষ কেউ জানত না। তাঁকে যতীন বলে ডাকতে হবে, তুমি বলতে হবে, আত্মীয়তার এই দাবী নিয়ে বাগচী সেনগুপ্তকে চিরদিনের জন্যে জয় করে নিলেন। এমন বন্ধুতা আজকালকার দিনে রূপকথার মতো শোনায়। আমি সেদিন অভিভূত হয়েছিলুম।

আমার বাড়ীতে আসতে যতীন্দ্রনাথের কুণ্ঠা ছিল। তাঁর আত্মসম্মানবোধ প্রখর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী এলে লোকে হয়তো ঠাওরাবে অনুগ্রহপ্রার্থী। হয়তো ভাববে দেশভক্ত নয়। দেশ স্বাধীন হলেও ম্যাজিস্ট্রেট সেই ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আমাদের দু'জনের একটা জায়গায় বড় একটা মিল ছিল। গান্ধী প্রীতি। গান্ধীহত্যায় আমাদের দু'জনের কী যে হয়েছিল সে আমরা দু'জনেই অনুভব করতুম, আর অনুভব বিনিময় করতুম।

তিনি বলতেন, "আমি বুঝতে পারছি গান্ধীজী সম্বন্ধে লেখা আপনাকে দিয়েই হবে। আপনিই এর জন্যে নির্দিষ্ট।" বস্তুত তাঁর আগ্রহেই আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হই, তবে কেবল তাঁর একার আগ্রহে নয়। আমার ছড়া শুনে তিনি বলেছিলেন, "আপনার অন্তরের তাপ

ছড়ার আকার না নিয়ে কবিতার আকার নিক। কবিতা না লিখলে কি তৃপ্তি হয়!” তাঁর আগ্রহেই আবার আমি কবিতায় মন দিই। তবে শুধু তাঁর আগ্রহেই নয়।

যতীন্দ্রনাথকে একবার আমি পরিহাস করে বলেছিলুম, “আপনি তো সারা জীবন ভগবানকে অস্বীকার করে এলেন। আপনার মতো নাস্তিক আর কোন্ কবি!” তিনি বললেন, তা নয়, তিনি ভগবান মানেন। আমি লক্ষ্য করেছিলুম তিনি পরম ভাগবত। যতীন্দ্রনাথের কবিতার আমরা ভুল অর্থ করেছি। তিনি নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না, বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ছিল না, তাঁর যে অভিযোগ বা অভিমান ছিল তা বিধাতার কাছেই, তা বিধানের বিরুদ্ধে।

তাঁর প্রত্যয় হয়েছিল এ সংসারে দুঃখই বৃহত্তর সত্য, কারণ দুঃখের ভাগটাই অধিক। যাঁদের প্রত্যয় এর বিপরীত তাঁদের বিরুদ্ধেও তাঁর আক্রোশ ছিল না। ছিল তাঁদের উক্তি সম্পর্কে একটুখানি শ্লেষ।

তাঁর কাব্যসঙ্কলন “অনুপূর্বা” আমাকে দিয়েছিলেন উপহার। অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন তা নিয়ে কিছু লিখি। আমিও কথা দিয়েছিলুম, লিখব। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে কথার খেলাপ হয়েছে। তিনি যে হঠাৎ এমন করে চলে যাবেন তা তো কল্পনা করতে পারিনি। করা উচিত ছিল। দেড় বছর আগে আমাদের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন। তখনি দেখেছিলুম তাঁর শরীর ভালো নয়। এখানে আমরা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলুম, তবে মেলার পরিচালনায় সমস্ত ক্ষণ ব্যাপৃত থাকায় দু’দণ্ড আলাপ করে তৃপ্ত হতে পারিনি। সেই অতৃপ্তি এ জীবনে মিটবে না। আফসোস করছি।

যতীন্দ্রনাথকে একবার বলেছিলুম, “সব রকম লোক কবি হয়েছে, কিন্তু যিনি ইঞ্জিনীয়ার তিনি কবি এমনটি ইতিহাসে হয়নি। আপনিই

একমাত্র উদাহরণ।” বাস্তবিক কী অদম্য কবিত্বশক্তি থাকলে মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করেও কাব্যলোকে আপনার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে যতীন্দ্রনাথ তার একমাত্র না হলেও উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর দরুন তাঁর কোনো নালিশ ছিল না। হয়তো ইঞ্জিনীয়ার না হয়ে জমিদার হলে তিনি আরো অনেক কবিতা, আরো ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। কিন্তু সে রকম সৌভাগ্য তিনি চাননি। সুযোগ যেটুকু পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। ক'জন মানুষ তা করে! আর তাঁর সমসাময়িক যাঁদের জীবিকার ভাবনা ছিল না কিংবা জীবিকা কঠিন ছিল না তাঁদের কেই বা তাঁর চেয়ে বেশী করেছেন, ভালো করেছেন!

যতীন্দ্রনাথের বিচার সাধারণত তাঁর রচনার যে অংশটা রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ সেই অংশটা নিয়ে হয়ে আসছে। হাতে সময় থাকলে আমি দেখাতুম যে তাঁর বৈশিষ্ট্য নেতিবাচক নয়। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথ নন বলেই যে তিনি বিশিষ্ট এটা ভুল বিচার। তিনি জগৎ সম্বন্ধে বিধাতা সম্বন্ধে যদি কিছু নাও লিখতেন তবু তাঁর বৈশিষ্ট্য থাকত, এমনি গভীর তাঁর বেদনা ও ছন্দোবদ্ধ তাঁর বেদনার প্রকাশ। তিনি বিদগ্ধ, তিনি দরদী, এই সুবাদে তিনি অবিস্মরণীয়। আর মানুষ হিসাবে অতি সজ্জন ছিলেন তিনি। চরিত্রের জন্যে সকলের শ্রদ্ধেয়। আমার চিত্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর মতবাদের জন্যে নয়, তাঁর কবিত্বের জন্যে এবং তাঁর মনুষ্যত্বের জন্যে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য।

শান্তিনিকেতন, ১২ই নভেম্বর ১৩৫৪।

ঐতিহ্য প্রসঙ্গ

(শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্রাবলী)

॥ ১ ॥

...গত পাঁচশো বছরে পাঁচটি বড় বড় ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে মধ্য-যুগের ইউরোপ আধুনিক ইউরোপে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর কেবল ইউরোপের নয় সব দেশের ললাটলিখন। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হতে হবে এশিয়া আফ্রিকাকেও। আমাদের চোখের উপর দিয়ে সেই যুগপরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

ঐ পাঁচটি ব্যাপার হলো (১) Renaissance, (২) Reformation, (৩) French Revolution, যার মূলমন্ত্র Liberty, (৪) Industrial Revolution এবং (৫) Socialist Revolution যার মূলমন্ত্র Equality.

প্রথমটি ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। এক শতাব্দী ধরে তার সঙ্গে সকলে পরিচিত। এক শতাব্দীরও উপর। দ্বিতীয়টিরও প্রবর্তক তিনিই। এ শুধু ব্রাহ্মসমাজে নিবদ্ধ থাকেনি। হিন্দুসমাজেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এরও বয়স এক'শতাব্দীর উপর।

তৃতীয়টির প্রবর্তন প্রয়োজন ছিল বলেই "সবুজপত্রে"র অবতারণা। পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির যে বাণী তা French Revolution থেকে উত্থিত নিখিল মানবের কণ্ঠস্বর। তা ইউরোপে নিবদ্ধ নয়, নিছক ইউরোপীয় নয়। গত চল্লিশ বছরে "সবুজপত্রে"র ভাব অপরাপর পত্রিকায় চারিয়ে গেছে। এখন সবুজপত্রের লেখাজোখা নেই। প্রায় সব কাগজই অল্পবিস্তর সবুজপত্র।

চতুর্থ ও পঞ্চম দুটি অধ্যায়ও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ভারত ধীরে ধীরে industrialised ও socialised হয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়া আরো দশ বিশ বছর এগিয়ে গেলে আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাবেন আপনার চারিদিক অন্যরকম হয়ে গেছে। পুরাতন ঐতিহ্য তার সঙ্গে খাপ না খেলে পুরাতনত্ব ত্যাগ করার কথা ঐতিহ্যেরই। পুরাতনের অন্তরালে যেটুকু চিরন্তন সেটুকু চির নূতন। তার লয় নেই। বাকীটুকু লুপ্ত হবেই। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সত্য ও অহিংসা চিরন্তন, তথা চির নূতন। তার লয় নেই। ভারত যদি সত্য ও অহিংসাকেই তার ঐতিহ্য করে তা হলে আর সব লুপ্ত হলেও আসল ঐতিহ্য চিরজীবী হবে। সত্য ও অহিংসা আধুনিক যুগের চেয়েও আধুনিক। ভবিষ্যৎ কখনো তাদের অস্বীকার করবে না। সব দেশ তাদের স্বীকার করবে। আর যেসব ব্যবস্থাকে আপনি ঐতিহ্য বলে আঁচলে বেঁধে রাখতে চান সে সব একে একে যাবেই। যাদুঘরই সে সব বস্তুর জন্যে বরাদ্দ।···

শান্তিনিকেতন, ২১ অকটোবর ১৯৫৪

॥ ২ ॥

···চৈতন্য আন্দোলন ও গান্ধী আন্দোলন দুটোর সঙ্গেই আমি গভীরভাবে যুক্ত। বাল্যকালে বৈষ্ণবধারায় মানুষ হয়েছি। আমার কাব্যসঙ্কলনের নাম "নূতনা রাধা"। ভবিষ্যতে যেসব কবিতা লেখার পরিকল্পনা আছে সেসবও বৈষ্ণবধারার কবিতা হবে প্রধানত। আমি লীলাবাদী। কোনো ইউরোপীয় তা নয়। সব ভারতীয় তা নয়। সব বাঙালী তা নয়। আধুনিক কবিদের মধ্যে ক'জন লীলাবাদী? আপনি যাঁদের ঐতিহ্য-প্রীতির প্রশংসা করেছেন তাঁদের ক'জন লীলাবাদী? শেষ পর্যন্ত আমি লীলাবাদী থাকব, রসিক থাকব, বৈষ্ণব

ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকব। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে বৈষ্ণব হব না। আমি অবতারবাদ বা গুরুবাদ বা সাকার উপাসনা মানিনে। শ্রীচৈতন্য আমার চোখে মানুষ ভিন্ন আর কিছু নন। শ্রীকৃষ্ণও তাই। কিন্তু রসের দিক থেকে আমি বৈষ্ণবদের সঙ্গেই রয়েছি। তখন 'রাধা' বা 'কৃষ্ণ' ও দুটি নায়কনায়িকা না হলে রস জমে না।

আমার ভাবী উপন্যাস "রত্ন ও শ্রীমতী" রসের দিক থেকে বৈষ্ণব ধারার। "শ্রীমতী" নামটি বৈষ্ণবদের কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে আমি স্বতন্ত্র ও অচিহ্নিত। আমার কোনো লেবেল নেই। আমি যাকে বলে non-conformist.

তারপর গান্ধীজীর প্রভাব আমার জীবনে সেই ১৯২০ সাল থেকে। আমিও কিছুদিন অসহযোগ করেছি। গান্ধীজীর মতবাদ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাই ১৯২৪-এর পর থেকে। আবার ফিরে আসি ১৯৩৯-এ। তারপর থেকে আজ অবধি 'সত্য' ও 'অহিংসা'য় আমার আস্থা অটুট আছে। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে যেসব কারণে আমার মতভেদ হয়েছিল ১৯২৪-এ, সেসব কারণ এখনো বিদ্যমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আর্ট সম্বন্ধে, সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বনত না। নারী সম্বন্ধে, নরনারী সম্পর্কের রসের দিকটার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বনত না। আর বনত না আধুনিকতা সম্বন্ধে। আধুনিককে তিনি পাশ্চাত্য বলে নয়, 'নীতিহীন' বলে সংশয়ের চোখে দেখতেন। এটা গোঁড়া ক্রিশ্চানদেরও চোখ। ঐতিহাসিক যুগবিশেষকে 'বিপথগামী' মনে করার ফলে ইতিহাস থমকে দাঁড়াবে না, উল্টো দিকে চলবে না, ঘড়ির কাঁটা পেছিয়ে যাবে না। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তাঁর জীবনী আলোচনার সময় এসব আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব। "গান্ধী" নামে একখানা বই লিখব ভেবেছি। এখন নয়।

মোটের উপর বলতে গেলে আমি গান্ধীজীর সঙ্গেই আছি ও থাকব, কিন্তু আর্টে নয়, নরনারীর প্রেমে নয়, আধুনিকতার ক্ষেত্রে নয়। গান্ধী যেখানে মানবপ্রেমিক, জনগণের বন্ধু সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে। যেখানে অন্যায়ের শত্রু, brute force-এর শত্রু সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে। যেখানে বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী, নৈরাজ্যবাদী সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে। "প্রত্যয়" বলে আমার একখানা বই আছে। তাতে গান্ধীবাদকেই মোটামুটি উপস্থাপন করা হয়েছে। তার উৎসর্গে এই কথাগুলি আছে —"সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অভিন্ন। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ অহিংস।" এটি ১৯৫১ সালের উক্তি।

এই বিশ্বাস ক'জন ভারতীয়, ক'জন বাঙালীর মধ্যে দেখেছেন? ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যে ক'জনের মুখে এ ঘোষণা শুনেছেন বা লেখনীমুখে এ স্বগতোক্তি শুনেছেন?

ইউরোপের ইতিহাসের যে পাঁচটি অধ্যায়ের উল্লেখ করেছি সেগুলির সারতত্ত্ব পাশ্চাত্য নয়, সার্বদেশিক। বিজ্ঞানচর্চা, সৌন্দর্য-চর্চা, humanism, secularism, nationalism, democracy, liberty, equality, socialism, communism-এর কোনোটাই গণ্ডীবদ্ধ নয়। ভারতের মাটিতে যে এগুলি গজাবে না, বাড়বে না, তা নয়। তবে মাটি অনুসারে ফসল হবে। মাটির প্রভাব আমি কোনো দিন অস্বীকার করিনি।···

শান্তিনিকেতন, ১২ই নভেম্বর ১৯৫৪

সুখদুঃখের কথা

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের একদল ছাত্রছাত্রী ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" অভিনয় করে ফিরেছে। যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি উচ্ছ্বাস তাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তার তুলনা নেই। ফিরে এসে তারা আমাদের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছে তার থেকে আমার নিশ্চিত প্রত্যয় হয়েছে যে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের মন বদলে গেছে। বার বার তারা এই কথাই বলেছে যে, "আমরা আগে বাঙালী, তার পরে মুসলমান।"

এ কথা শুনে পরম সুখী হয়েছি। যারা এতদূর এসেছে তারা আর পেছিয়ে যাবে না, পেছিয়ে যেতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান আর ধর্মোন্মাদ হবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে। সেটা এখন ইতিহাসের সামিল। তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নেই। তবে কতক লোক থাকবে তারা চিরকাল ধর্মোন্মাদ। তেমন লোক হিন্দুদের মধ্যেও আছে এই ভারতেই। খ্রীস্টানদের মধ্যেও কি নেই? তাদের হাতে ক্ষমতা না থাকলেই হলো।

সব দেশেই সব সময় কিছু সংখ্যক ধর্মোন্মাদ থাকবে। কিন্তু বাদ বাকী লোকের কাজ হবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা তাদের হাতে পড়তে না দেওয়া। আমেরিকার শাসনতন্ত্রপ্রণেতাগণ প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। প্রায় দু' শতাব্দী অতীত হ'তে চলল এখনো আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ধর্মান্ধদের হাতে পড়ে নি। ভারতের শাসনতন্ত্রপ্রণেতারা আমেরিকার নজির অনুসরণ করেছেন। দুঃখের কথা পাকিস্থানের নবপ্রবর্তিত শাসনতন্ত্র আমেরিকার শিক্ষা অগ্রাহ্য করেছে। এর থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে ধর্মোন্মত্ততার জন্যে রাজদ্বার খুলে রাখা হয়েছে। ধর্মান্ধরা যে কোনোদিন রাষ্ট্র অধিকার করতে পারে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর।

এর চেয়ে দুঃখের কথা পূর্ব বঙ্গ থেকে ইদানীং যে হারে লোক চলে আসছে সে হারে আসতে থাকলে পূর্ব বঙ্গ অচিরে হিন্দু শূন্য হবে। মাথা নেই তার মাথাব্যথা ! ধর্মান্ধতার পুনরাবৃত্তি হবে কাকে অবলম্বন করে ? হিন্দুকে নয়, কারণ হিন্দু থাকবে না পূর্ব বঙ্গে। এ ধরনের সমাধানকে আমি সমাধান বলিনে। এটা সমাধানকে ফাঁকি দেওয়া। অতি বড় ধর্মোন্মাদেরও ইচ্ছা নয় যে বিধর্মীরা বিলুপ্ত হয়। অতি বড় ধর্মান্ধ শুধু এই চায় যে বিধর্মীরা মাথা হেঁট করে থাকবে, কথায় কথায় চড়টা চাপড়টা খাবে, গোলামের মতো খাটবে, কখনো সমান হতে চেষ্টা করবে না। অর্থাৎ হিন্দুকে হরিজন হতে হবে। হিন্দু মাত্রেই অস্পৃশ্য। তার জন্য আলাদা নির্বাচন-পদ্ধতি। সে অনুগ্রহভাজন হলে দুটো একটা উজিরী পাবে হয়তো, কিন্তু কোনো রকম চাবি-পদ তাকে দেওয়া হবে না। তার দাবী নেই।

অবশ্য চাবি-পদ ক'জন মুসলমানকেই বা দেওয়া হবে ? কার্যত কয়েকজন ভাগ্যবানেরই ভাগে পড়ে ওসব আকাশকুসুম। সাধারণ মুসলমান ওর থেকে বঞ্চিত। তা হলে হিন্দুর মনে লাগে কেন ? মনে লাগে এই জন্যে যে সাধারণ মুসলমান এর প্রতিবাদ করে না, করলেও মন থেকে করে না। আরো মনে লাগে এই জন্যে যে সাধারণ মুসলমান হাজার বঞ্চিত হলেও শাসক সম্প্রদায়ের লোক, হিন্দুর মতো শাসিত সম্প্রদায়ের লোক নয়। শাসক ও শাসিতের এই যে ব্যবধান এটাকে মিষ্টি কথা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাশাপাশি দু'জন মজুর মেহনত করছে, মজুরিও সমান দু'জনের। কিন্তু যেটি হিন্দু সেটি শাসিত সম্প্রদায়ের লোক, যেটি মুসলমান সেটি শাসক সম্প্রদায়ের। নবাব নয়, কিন্তু নবাবের নাতি।

এই যেখানকার মূল সত্য সেখানে কোনো দিন শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারে না। গণতন্ত্র তো গোড়া থেকেই খোঁড়া।

আধুনিক সভ্যতার স্তম্ভ বলতে যা বোঝায়—পার্লামেণ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন—তার ভিত শক্ত হবে না পাকিস্তানে। গরিবের স্বার্থ দেখবে কে? কেমন করে? গরিব তা হলে বাঁচে কী করে? সে গরিব যদি শাসিত হয়ে থাকে তবে তো তার ভবিষ্যৎ বলতে বিশেষ কিছু নেই। সে তো পালাতে চাইবেই। আজকাল যারা চলে আসছে তারা গরিব হিন্দু, প্রধানত হরিজন হিন্দু। এতদিন তারা মাটি কামড়ে পড়েছিল। মাটি ছাড়া তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই বলে। আমরা তাদের জন্য মাটি খুঁজে পাই কোথায়? অগত্যা বিহারের সঙ্গে মিলনের কথা ভাবতে হচ্ছে। বহু লোক এ প্রস্তাবের বিরোধী। তাঁরা আগে বাঙালী তার পরে ভারতীয়। কিন্তু এক কোটি পূর্ব বঙ্গের হিন্দু ঘাড়ে চাপলে পশ্চিম বঙ্গের লোককে বিহারের দ্বারস্থ হতে হবেই। এ বড় সাংঘাতিক লজিক।

কী করে এই জনস্রোত রোধ করা যায় সেই আজকের সব চেয়ে জরুরি প্রশ্ন। আমি যত দূর বুঝতে পারছি এই আট বছরে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানের মন হিন্দুর প্রতি অনুকূল হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর অন্তরে যে কাঁটা বিঁধেছে তা গভীর থেকে আরও গভীরে চলে গেছে এই আট বছরে। সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না যে পাকিস্তানে তার কোনো ভবিষ্যৎ আছে বা তার সন্তান সন্ততির কোনো চিরন্তন স্থান আছে। হিন্দুরা যে সব কাজ করে সে সব কাজ এমন কাজ নয় যে মুসলমানরা শিক্ষা ও সুযোগ পেলে করবে না, করতে পারে না। এক এক করে সব রকম কাজই মুসলমানরা করতে শিখবে ও করবে। তা হলে হিন্দু থাকবে কেন, কিসের আশায়? চাষবাস, কলকারখানার কাজ, মুদিখানা, ছোটখাটো ব্যবসা, এর কোনটাই বা মুসলমানের অসাধ্য! বাস্তবিক হিন্দুর আঁকড়ে ধরে থাকার মতো কোনো নোঙর নেই। একদিন না এক দিন সে কর্মচ্যুত হবেই। তা হলে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তার লাভ কী?

এইখানেই গলদ। রাজ্য যদি মুসলমানের হয়, ইসলামী হয়, রাজ্যের সব ক'টা চাবি মুসলমানের হাতে থাকে, তা হলে হিন্দু হয় স্বল্প মেয়াদী অধিবাসী। তার থাকার মেয়াদ ততদিন যতদিন মুসলমান প্রস্তুত হয়নি সব রকম কাজের জন্যে। এ বিশ্বাস আট বছরে ক্ষীণতর না হয়ে দৃঢ়তর হয়েছে বলেই এত লোক বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে। পূর্ব বঙ্গের মুসলমান আজ না বুঝলেও কাল বুঝবে যে এতে পূর্ব বঙ্গের তথা মুসলমান সম্প্রদায়েরও ক্ষতি। শরীর থেকে রক্ত চলে গেলে দুর্বল হয় না এমন জীব নেই।

(১৯৫৬)

বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গে

(শ্রীশিবনারায়ণ রায়কে লিখিত পত্র)

...বিদেশী সাহিত্যের উপর লিখতে আমি চেষ্টা করেছি। বিদেশী সাহিত্য অনেক সময় বিশ্বসাহিত্য। সুতরাং আমাদেরও সাহিত্য। আমাদের সেই বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকার বুঝে নেওয়া আমাদের সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু কিছুদিন চেষ্টা করে আমার এই শিক্ষা হলো যে বিশল্যকরণী তুলে আনতে হলে গন্ধমাদনও বয়ে আনতে হয়। বিদেশী সাহিত্যের পটভূমিকা যাদের জানা নেই তাদের কাছে পট-ভূমিকাটাও উপস্থিত করা দরকার। ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্মান সাহিত্য কী ভাবে বিবর্তিত হলো, কোন্ ধারার পর কোন্ ধারা এলো, কাকে বলে রেনেসাঁস, কাকে বলে রোমান্টিসিজম, ঝড়ঝাপটার যুগটাই বা কী ও কেন, এসব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলে পরে বিচার করা সহজ

হয়। অথচ অত বর্ণনা করার সময় কই আমার? তা ছাড়া পাঠকের হাতের কাছে বই কোথায় যে সে মিলিয়ে নেবে? বাংলাভাষায় এখনো যথেষ্ট অনুবাদগ্রন্থ নেই, ইতিহাসগ্রন্থ নেই। তা যতদিন না হয়েছে বাঙালী পাঠক বরং ইংরেজী প্রবন্ধ পড়বে, তবু বাংলা প্রবন্ধ পড়বে না।…

রেনেসাঁস কথাটি আজকাল সর্বত্র শুনতে পাই। আপনি সে-সম্বন্ধে লিখে ক্ষান্ত হননি, অন্যান্য প্রবন্ধেও তার অবতারণা বা উল্লেখ করেছেন। বুঝতে পারছি সেটি আপনার একটি প্রিয় শব্দ। আপনার সঙ্গে মোটামুটি একমত হলেও আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে। রেনেসাঁস মানে নবজন্ম। ইউরোপে যখন রেনেসাঁসের সূচনা দেখা দেয় তখন ইউরোপের লোক প্রাচীন গ্রীক জীবনাদর্শের সূত্র হারিয়ে ফেলেছিল। রেনেসাঁস হলো নতুন করে প্রাচীন গ্রীক জীবনাদর্শের সূত্রপাত। তা বলে খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শের অন্তর্ধান ঘটল না। এতদিনেও ঘটেনি। ঘটবার কোনো লক্ষণ নেই। খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শের একচ্ছত্র রাজত্ব গেল, তার একজন পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল, এই পর্যন্ত বলা যায়। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের আকাশে যুগল সূর্য বিরাজমান। তাদের সহ-অস্তিত্ব এতদিনে লোকের সয়ে গেছে। রেনেসাঁসের জীবনাদর্শ ও খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শ দুই নিয়ে সাহিত্য। অবশ্য কোনোটাই অবিবর্তিত থাকেনি। এক অপরকে প্রভাবিত করেছে। কোন্ উৎস থেকে যে কোন্ স্রোতটা এসেছে তা ইতিমধ্যে লোকে ভুলে গেছে। এই যেমন ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। আপনার ধারণা এটা রেনেসাঁসের অন্যতম সুফল। কিন্তু রেনেসাঁসের মূলে যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা তার ভিত্তি-শিলা ছিল ক্রীতদাস প্রথা। প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ কেউ এর জন্যে লজ্জিত ছিল না, বোধহয় কোনো আদর্শবাদী কল্পনাও করেননি যে দাসহীন সভ্যতা সম্ভবপর। পক্ষান্তরে কিংডম অফ গড বলতে আদি

খ্রীস্টীয় সাধক ও ভাবুকরা যা বুঝতেন তাতে সবাইকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার খোরাক রোজ অর্জন করতে হতো। সমাজের শেষতম ব্যক্তিরও মজুরিতে সমান অধিকার। রাস্‌কিন ও টলস্টয়ের বইগুলো পড়ে দেখবেন। কার্যক্ষেত্রে বহু অন্যায় সহ্য করলেও খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শ গোড়া থেকে সব মানুষের সমান সত্যতা স্বীকার করে এসেছে। কিন্তু সবার উপর মানুষ সত্য বলেনি। রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য সেই ক্ষেত্রে।

"সবার উপর মানুষ সত্য" এ যদি হয় রেনেসাঁসের মর্মবাণী তবে খ্রীস্টীয় জীবনবেদের সারতত্ত্ব হচ্ছে "সব মানুষই সমান সত্য।" ক্রীতদাস প্রথা এর সঙ্গে খাপ খায় না। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন যাঁরা তাঁরা সাধারণত বিবেকী খ্রীস্টান; কোনো রেনেসাঁসপন্থীকে ঐ সংগ্রামের ক্ষেত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এখানে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে খ্রীস্টীয় চার্চ ও খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শ এক জিনিস নয়। চার্চ ক্রীতদাসপ্রথা সমর্থন করতে পারে, যীশু স্বয়ং তা পারতেন না। এমনি আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। মোট কথা রেনেসাঁসপন্থীরা প্রকৃতির উপর মানুষকে জিতিয়ে দিয়েছেন, মাথার উপর ঈশ্বর বলে কাউকে রাখেননি, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্ব যেখানে সেখানে পেগান জীবনাদর্শ উদাসীন। কারণ সে আদর্শ নীতিদুর্নীতি নিরপেক্ষ। অপর পক্ষে, খ্রীস্টীয় আদর্শ নৈতিক। তা নিরপেক্ষ নয়। রেনেসাঁসের কিছুকাল পরে ইউরোপের কয়েকটি দেশে রেফরমেশন বলে আরো একটা অধ্যায় শুরু হয়। এর প্রতিষ্ঠা-ভূমি রেনেসাঁস নয় বা উভয়ের মূলে প্রাচীন গ্রীস নয়। এটা খ্রীস্টীয় জীবনাদর্শেরই স্বয়ংসংশোধন। যেসব দেশে কেবলমাত্র রেনেসাঁস হয়েছে সেসব দেশের চেয়ে যেসব দেশে রেনেসাঁস ও রেফরমেশন দুই হয়েছে সেসব দেশ অনেক বেশী অগ্রসর। বলা যেতে পারে ইংলণ্ড

ও জার্মানী রেফরমেশনের ভিতর দিয়ে গেছে বলেই ইটালী ও স্পেনের চেয়ে অগ্রসর। আর ফ্রান্সের প্রোটেস্টাণ্টরা সংখ্যাধিক না হলেও তাদের অস্তিত্বের দরুন ফ্রান্স ইটালীর চেয়ে অগ্রসর হয়েছে। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু রেফরমেশনের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। রেফরমেশন বাদ দিয়ে এলিজাবেথের ইংলণ্ড কল্পনা করা যায় না। ডেমক্রেসী যে দুটি দেশে সব চেয়ে সক্রিয়—ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—সে দুটি দেশের শক্তির সোপান রেফরমেশন। সাধারণত প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যেই বিবেক-চালিত প্রতিরোধকারীদের দেখতে পাই।

আমাদের এ দেশের রেনেসাঁসের নায়ক বলে যাঁদের গণ্য করা হয় তাঁদের প্রায় সকলেই সঙ্গে সঙ্গে রেফরমেশনেরও নায়ক। আমাদের রেনেসাঁস ও রেফরমেশন একই কালে আরম্ভ হয়। উভয়েরই অগ্রদূত রামমোহন। উভয়েরই মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ। লক্ষণীয় এই যে এঁরা কেউ প্রাচীন গ্রীসের জীবনাদর্শে বিশ্বাসবান নন, পেগান নন, amoral নন। আমাদের রেনেসাঁসে তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল সুরটি বাজেনি। আমরা বরং রেনেসাঁস কথাটি ব্যবহার করেছি আমাদের স্বকীয় জীবনাদর্শের নবজন্ম দ্যোতনা করতে। আমাদের স্বকীয় জীবনাদর্শ বলতে আমরা বুঝি উপনিষদের যুগের জীবনাদর্শ। সে আদর্শ পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা আচ্ছন্ন ও ইসলামী আদর্শের দ্বারা অবলুপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি বৌদ্ধ জীবনাদর্শেরও পুনরুদয় দেখা যাচ্ছে। আমাদের রেনেসাঁসের এটাও অঙ্গ। ঠিক ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস এ দেশে কোনোদিন হয়েছে কি না সন্দেহ। কিন্তু হলে মন্দ হয় না। তারও প্রয়োজন আছে। কারণ শিল্প ও বিজ্ঞান চায় amoral দৃষ্টি। যে দৃষ্টি নীতি-দুর্নীতির বাইরে বা উর্ধ্বে। বলা বাহুল্য সে দৃষ্টি দুর্নীত নয়, immoral নয়। তফাতটা ভাল করে বুঝতে ও

বোঝাতে হবে। নয়তো immoral বলে amoral-কেও দ্বীপান্তরে পাঠানো হবে।

অপর পক্ষে, সমাজে রাষ্ট্রে অর্থনীতিতে রাজনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেসব ক্ষেত্র নীতি-দুর্নীতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে নয়। আধুনিক ইউরোপ ঠিক এই জায়গায় ভ্রান্ত। যেখানে 'মরাল অর্ডার' চাই সেখানে যারা 'আমরাল' দৃষ্টির পক্ষে তারা ক্ষমতাসীন থাকলে মহতী বিনষ্টি। সেরূপ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ শ্রেয়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ও বিজ্ঞানে 'আমরাল' দৃষ্টির জন্যে ঠাঁই করে নিতে হবে। এ এক কঠিন সীন্থেসিস। এটা কিন্তু একেবারে অসম্ভব হবে যদি আমরা 'আমরালে'র জন্যে জীবনের সব কটা ক্ষেত্র দাবী করতে যাই। কিবা 'আমরাল'কে ছাড়িয়ে গিয়ে 'ইম্‌মরালে'র পর্যায়ে উঠি। ইউরোপে তাও দেখছি। অসীম প্রাণশক্তির সঙ্গে উৎকট বিষ, অমিত স্বাস্থ্যের সঙ্গে অসাধ্য রোগ, অপূর্ব রূপলাবণ্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন জরা—এই হচ্ছে আজকের ইউরোপ। যত রকম বিকার বিকৃতি বাতিক ছিট সব কিছু এসেছে জীবনে। জীবনে এসেছে বলে সাহিত্যেও এসেছে। এদের প্রতি নরম হতে যাওয়া মিছে। এ জিনিস পেগান নয়, 'আমরাল' নয়। পেগান হলো প্রকৃতি। এ হচ্ছে বিকৃতি। পেগান হলো যৌবন। এ হচ্ছে জরা।

আমাদের দেশের লোক পশ্চিম সম্বন্ধে প্রেজুডিসগ্রস্ত বলে আমাদের কর্তব্য তাদের সেই প্রেজুডিস দূর করা। তা বলে পশ্চিমের ভিতরে যে বিষক্রিয়া চলেছে তার সমর্থন করতে পারিনে। পশ্চিমের মধ্যে যা বিশ্বজনীন বা চিরন্তন তা যেমন পাশ্চাত্য বলেই হেয় নয়, তেমনি পশ্চিমের মধ্যে যা ক্ষয়িষ্ণু বা পচা তা উন্নতির সঙ্গে মিশ্রিত বলেই শ্রেয় নয়। আধুনিক ইউরোপে যুদ্ধ ও বিপ্লবের গোলমালে এমন একটা মূল্যবিভ্রাট ঘটেছে যে, যার যা দর নয় সে তাই পাচ্ছে, যার যা দর সে তা পাচ্ছে না। মাথা একদম ঘুলিয়ে গেছে। অন্তঃসার, অন্তঃসৌন্দর্য,

এ সব যেন কিছুই নয়। যেন বাইরের ও ভিতরের নরকটাই বস্তুসত্তা। হিউমানিজম যেন ইন্‌হিউমান বা য়্যান্টিহিউমান। আমার তো মনে হয় সামনের পঞ্চাশ বছর কেটে যাবে প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়ে আনতে।

এ দেশ বহু শত বছরের জরাগ্রস্ত অবস্থার পর সবে একটু তরুণ হতে আরম্ভ করেছে। এ দেশের লেখক আমরা এই নবলব্ধ তারুণ্যকে আরও সত্যিকার করব। নয়তো এ হবে পাকা চুলে কলপ মাখানোর মতো ব্যাপার। ধোপে টিকবে না। ইউরোপের দৃষ্টান্ত আগে আমাদের কাজে লেগেছে। আমাদের চিন্তানায়করা ইউরোপের সাহায্য না পেলে প্রাচীন ভারতকেও পুনরাবিষ্কার করতে পারতেন না। এখনো ইউরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের সহায় হতে পারে।···

শান্তিনিকেতন, ২৩শে মে ১৯৫৬

বিনোবাজী

(শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্তকে লিখিত পত্র)

॥ ১ ॥

···বিনোবাজীর যত দিন বিনা বেতনের সহকর্মী জুটবে, যত দিন মুখের কথায় জমি জুটবে, তত দিন ভূদান আন্দোলন ঘড়ির কাঁটার মতো টিক টিক করে চলবে। চার দিক থেকে বাধা পেলে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। তার warning এই অনশন। গান্ধীবাদীদের কর্মপদ্ধতি হলো এই রকম। তারা যা ন্যায় মনে করবে তার প্রতিষ্ঠা করবে এই ভাবে। তাদের থামিয়ে দেবার একমাত্র উপায় তাদের

জেলে দেওয়া বা খুন করা। তাতে তাদেরই নৈতিক জয়। তারা পার্লামেণ্টের পথ দিয়ে যাবে না। রক্তপাতের রাস্তা দিয়েও না। তাদের ওটা তৃতীয় পন্থা। এখন পর্যন্ত ওপথে লোকাভাব ঘটেনি।···

শান্তিনিকেতন ৫ই জুন ১৯৫৬

॥ ২ ॥

···জমির মালিক আইন অনুসারে ভারতসম্রাট। এখন তো ভারতসম্রাট নেই, এখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তার মানে ভারতের সমগ্র নাগরিকমণ্ডলী। কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক নয়। কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর লোককে proprietorship বা মালিকী স্বত্ব দেবার সঙ্কল্প এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই করছেন না। রুশ দেশে লেনিনও করেননি। যে চাষ করবে সে usufruct পাবে এই পর্যন্ত লেনিন গেছলেন, বিনোবাও যাচ্ছেন। বিনোবার পরিভাষায় সব জমি গোপালের। গোপালের জমি তুমি যদি চাষ করতে চাও তোমাকে কয়েক বিঘা জমি দেওয়া হবে, মালিকী স্বত্বে নয়—usufruct ভোগ করার স্বত্বে। তোমাকে ওটা দিতে হলে অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের শাসনতন্ত্রে বাজেয়াপ্ত করা নিষেধ। ক্ষতিপূরণ দিয়ে নেওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপরিচালকরা যদি ক্ষতিপূরণ দিয়ে রামের দখলী জমি শ্যামকে দিতে যান তা হলে দারুণ মুদ্রাস্ফীতি হবে। কারণ শ্যামের সংখ্যা কয়েক কোটি। বর্তমান সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্যে ব্যয় করবেন, না ক্ষতিপূরণের খাতে ব্যয় করবেন? তাঁরা আপাতত নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য। তাই বিনোবাজীকে

সক্রিয় হতে হয়েছে ও বিনা ক্ষতিপূরণে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে শ্যামকে জমি চষবার ও usufruct ভোগ করার সুযোগ দিতে হচ্ছে।···
শান্তিনিকেতন ৮ই জুন, ১৯৫৬

অতীত উপাসনা

(ঢাকার "যুগবাণীর" পক্ষে শ্রীপ্রাণকুমার সেনকে লিখিত পত্র)

আপনাদের পত্রিকা পেয়েছিলুম। আপনার চিঠিও পেলুম। এবার আমি উপন্যাস রচনায় তন্ময়। ধ্যানভঙ্গ করে শারদীয় সংখ্যাগুলির জন্যে লেখা সঙ্গত নয়। যখন একটু দম নিতে ইচ্ছা করে তখন দুটি একটি খুচরো রচনায় হাত দিই। এই চিঠিও সেই জাতীয় রচনা। এটি যদি প্রকাশযোগ্য হয় এই আমার পুষ্পাঞ্জলি।

আমার কাছে দুনিয়ার অনেক দেশের পত্রিকা আসে। আমেরিকার, ইংলণ্ডের, চীনের, মিশরের ইসরায়েলের, পাকিস্তানের। আগ্রহের সঙ্গে পড়ি। সময় না থাকলে চোখ বুলিয়ে যাই। রুশদেশের পত্রিকা পাইনে। কাজেই তুলনায় কে কতটা অগ্রসর তা বলা আমার পক্ষে কঠিন। তুলনা করব না। শুধু এইটুকু বলব যে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ জোর কদমে, কেউ শামুকের গতিতে।

কোন্ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারও একটা আভাস পাওয়া যায়। শিল্পায়ণের দিকে। যাকে বলে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। এ জিনিসটি গান্ধীজীর কাছে ভালো ঠেকত না। আমরা যারা তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছি আমাদের কাছেও না। কিছু কাল থেকে আমি নিজেকে এই বলে বুঝ দিয়েছি যে আমাদের দেশের মূল সমস্যা দূর করতে হলে

মন্দের ভালো হিসাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মেনে নিতে হবে। নইলে মূল সমস্যা মিটবে না।

মূল সমস্যা আমাদের কোন্‌টি? কেউ বলবেন পরাধীনতা। কেউ বলবেম দারিদ্র্য। কেউ বলবেন অজ্ঞতা। আমি বলব অতীত উপাসনা। দেশটা এত পুরাতন যে লোকে তার জন্যে লজ্জিত না হয়ে গর্বিত বোধ করে। আমি এর মধ্যে গর্বের কিছু পাইনে। কারণ যা নিয়ে আমাদের গর্ব তা আমাদের নিজেদের হাতে গড়া নয়, তা আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জিনিস। কেউ যদি জানতে চায় আমরা নিজেরা কী গড়েছি তা হলে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া উচিত।

এত কাল আমাদের একটা সাফাই ছিল, আমরা তো গড়তেই চাই, কিন্তু ইংরেজ আমাদের গড়তে দিচ্ছে না। এখন তেমন কোনো কৈফিয়ত নেই। এখন যদি আমরা কিছু না গড়ি বা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ি তা হলে দুনিয়ার লোক বলবে এরা এ যুগের মানুষ নয়। এরা বিগত যুগের ভূত। পূর্বপুরুষের বড়াই করে কারা? যারা অপদার্থ। অতীতের উপাসনা করে কারা? যারা অন্তঃসারশূন্য।

যে যুগে আমরা বাস করছি সে যুগটা কী, তার বৈশিষ্ট্য কোন্‌খানে, কী করে আমাদের জীবনে সেই বৈশিষ্ট্য ফুটবে, কী করে আমরা আমাদের যুগের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান কদমে অগ্রসর হতে পারব—এসব কথা ভাবতে হবে, আর দশজনকে ভাবাতে হবে। দেশের স্বাধীনতা যতদিন সুদূর ছিল ততদিন আমরা দেশের স্বাধীনতাকেই ধ্রুবতারা করে তার দিকে এগিয়েছি। এখন দেশ আমাদের স্বাধীন। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে অন্যান্য স্বাধীন দেশের যা লক্ষ্য। প্রত্যেক দেশই ভবিষ্যতের জন্যে প্ল্যান করছে। যার ফলে সব নাগরিকই কাজ পাবে, মজুরি পাবে, বিচার পাবে, ভোটের অধিকার পাবে, ভাত পাবে, কাপড় পাবে, ঘর পাবে, শিক্ষা পাবে, সংস্কৃতি পাবে। এটা

যদি গান্ধীবাদী বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা হতো তা হলে আমার কোনো আফসোস থাকত না। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে এটা কেন্দ্রীকরণের যুগ, বিকেন্দ্রী করণ আপাতত পদচারণ করবে, আরো ভালো করে প্রস্তুত হবে।

আর একটি কথা। যে যত পশ্চাৎপদ তার প্রগতি তত দ্রুত হওয়া দরকার। মার্কিনের চেয়ে রুশের প্রগতি দ্রুত হবে, রুশের চেয়ে চীনের, চীনের চেয়ে ভারতের, ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের। তার জন্যে কোমর বেঁধে ডবল মার্চ করতে হবে। নেতারা অক্ষম হলে নেতা বদল করতে হবে। হচ্ছেও তাই। শিরদার তো সরদার। সে-ই নেতা যে সব চেয়ে অগ্রসর। বলা বাহুল্য সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও সে ঘোরতর আধুনিক।

শান্তিনিকেতন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

অনর্থ

("সংহতি"সম্পাদক শ্রীসুরেন নিয়োগীকে লিখিত পত্র)

এবার শারদীয়া সংখ্যার জন্যে নতুন কিছু লেখা হয়ে উঠছে না। ব্যক্তিগত জীবনে একটার পর একটা বাধা আসছে। কিন্তু তার চেয়ে বড কথা আমি এখন অন্যমনস্ক। উপন্যাস রচনায় আমার সবটা মন নিবিষ্ট। ভবিষ্যতে আরো একাগ্র হতে হবে। খুচরো লেখা ক্রমেই কমে যেতে থাকবে। সেইজন্য আমি ভেবে রেখেছি যে চিঠি লিখব। চিঠির ভিতর দিয়ে যা বলবার তা বলব। অবশ্য কোনো একজনকে নয়।

সম্প্রতি একখানি বিদেশী পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ নিয়ে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। বইখানি আমি চোখে দেখিনি। কানে শুনেছি তাতে নাকি মহাপুরুষ মহম্মদ সম্বন্ধে আপত্তিকর উক্তি ছিল। ভারতে প্রচারিত কোনো গ্রন্থে ভারতীয় একটি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে এমন কোনো উক্তি থাকলে তাদের মনে আঘাত লাগবেই। কিন্তু সে আঘাত যদি আইনসঙ্গত আন্দোলনের রূপ না নিয়ে আইনবিরোধী কার্যকলাপে পর্যবসিত হয় তা হলে রাষ্ট্রের ভিত্তি-মূলে আঘাত লাগে।

তা ছাড়া কোনো উগ্রপন্থী যদি ধর্ম থেকে রাজনীতিতে উপনীত হয়, কংগ্রেসকে ভোট না দেবার কথা বলে, যদি সাম্প্রদায়িক দল গঠন করার উদ্যোগ করে তা হলে ব্যাপারটা রাজনৈতিক আকার নেয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য কী, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় কী, সহায়ক কারা, তারা বিদেশী কি না, এসব প্রশ্ন একে একে ওঠে। ভাবনার কারণ ঘটে যদি অত্যুৎসাহী কেউ কেউ পাকিস্তান জিন্দাবাদ বা হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ হাঁকে। এদের ক্ষমা করা যায় না, যদি না এরা আপনা থেকে অনুতপ্ত হয়, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

কিন্তু এর পর যা আমি বলব তা হয়তো আপনার মুখরোচক হবে না। অন্যায় যারা করেছে তাদের সায়েস্তা করার ভার রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে না নিয়ে ভারতের অপর একটি সম্প্রদায় যদি নেয় তবে সেটাও রাষ্ট্রদ্রোহ। তারও শাস্তি আছে। রাষ্ট্র যদি শাস্তি দিতে ডরায় তা হলে রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নেবে বহু সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত। ধর্মের মুখোশটা তাদের নিজেদের কাজে লাগাবে। সেইজন্যে রাষ্ট্র এক্ষেত্রে দুর্বল হতে পারে না। নতুন আইনের কথা প্রধান মন্ত্রীর মুখে শোনা যাচ্ছে। তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমরা কেউ মধ্যযুগে পড়ে থাকতে চাইনে। এই সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাত ভারত পাকিস্তান

ব্যতীত পৃথিবীর আর সব দেশ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে উঠে গেছে। এখানে এর অস্তিত্ব আমাদের আন্তর্জাতিক সুনাম বৃদ্ধি করছে না। কী করে আমরা জগতের সামনে মুখ দেখাব ?

শান্তিনিকেতন, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

স্বধর্ম

(শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্রাবলী)

॥ ১ ॥

"লেডী কিলার" লেখা হয়ে গেলে আমার মনে হলো যে আমি liberate করলুম ও liberated হলুম। এ ভাব আগেও অনুভব করেছি, কিন্তু এমন স্পষ্ট করে নয়। তার পর থেকে ভাবছি আমার দুটি role বা ভূমিকা। একজন মুক্তিদাতা বা liberator, সে মুক্তি দিতে এসেছে। মুক্তি দিয়েই তার মুক্তি। আরেকজন বিশুদ্ধ শিল্পী বা pure artist ; সে সৃষ্টি করতে এসেছে। সৃষ্টি করেই সে বিশ্বসৃষ্টিতে যোগ দিচ্ছে। বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে।

'রত্ন ও শ্রীমতী'তে আমি একাধারে দুই। মুক্তিদাতা ও শুদ্ধ শিল্পী। গোড়ায় ইচ্ছা ছিল কেবলমাত্র শিল্পসৃষ্টি করব। পরে ভেবে দেখা গেল তাতে আমার তৃপ্তি নেই। সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত 'রত্ন ও শ্রীমতী'র পরিকল্পনা বদলে গেল। এখন ওর মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে liberation-এর সমন্বয় ঘটল। ফলে আমার দায় ও দায়িত্ব বেড়ে গেল। এক চোখ আর্টের উপর এক চোখ বন্ধনমুক্তির উপর—এতে একাগ্রতারও হানি। ভালো করলুম কি মন্দ করলুম এখনো বুঝতে পারছিনে। হয়তো দুই নৌকায় পা দিয়ে তলিয়ে যাওয়াই ঘটবে।

কিন্তু এতেই আমার চরম পরিতৃপ্তি। কিংবা বলতে পারো এইটেই predetermined.

আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই তো আমাকে করতে হবে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বৃথা। ওঁদের ধর্ম আমার পক্ষে পরধর্ম। ভয়াবহ। আমি যদি পরীক্ষায় ফেল করি তার অর্থ এই হবে যে পরীক্ষাটা আমারই জন্য অনুষ্ঠিত একটা special test ; সাহিত্যের যদি কোনো general test থাকে আমি তাতে নাম দিইনি। আমি সাধারণ পরীক্ষার্থী নই। সাধারণ পরীক্ষায় পাস করতে আমার উৎসাহ ছিল না ও নেই। সাহিত্যের কথাই বলছি। আমার বরাবরই সঙ্কল্প নিজের সামনে বিশেষ একটি লক্ষ্য রেখে সেই লক্ষ্য ভেদ করা। লক্ষ্যটা আমারই নির্বাচিত। অস্ত্রও আমারই মনোনীত। লক্ষ্যভেদ অনিশ্চিত। এর জন্যে অনেক কিছু করতে হবে। করেছি। করছি।

শান্তিনিকেতন, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৬

পুনশ্চ : তারপরে মনে পড়ল যে আমার আরো একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু সেই তৃতীয় ভূমিকা বা role আমি 'রত্ন ও শ্রীমতী' থেকে স্বতন্ত্র রেখেছি। আমি গান্ধী টলস্টয় ইত্যাদির সহকর্মী, আমার লেখার ভিতর দিয়ে "Kingdom of God" নিকটতর হবে। তোমরা যাকে বলবে utopian আমি তা-ও। কিন্তু এ গ্রন্থে আমি আমার তৃতীয় ভূমিকায় নামব না। সে ভূমিকা অন্য কোনো গ্রন্থের অপেক্ষা রাখে। আমি সে ভূমিকা স্থগিত রেখেছি বলে একেবারে ছেড়ে দিইনি। সাহিত্যে যদি সে ভূমিকায় অবতীর্ণ না হই তবে জীবনে হতে পারি। সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। সতর্ক না থাকলে সহজেই প্রচারমূলক হয়ে ওঠে রচনা। ওটা পরিত্যজ্য। কোনোদিনই আমি প্রচারক হব না। না হয় না-ই হলো utopia.

॥ ২ ॥

'রত্ন ও শ্রীমতী'র জন্যে আমি বিশ বাইশ বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছি। এখনো প্রস্তুতির অনেক বাকী। কিন্তু এখন যে রকম প্রতিবন্ধক পাচ্ছি কখনো সে রকম কল্পনা করিনি। এ বাধা পাঠকদের বা সমালোচকদের কাছে থেকে আসছে না। এ বাধা কাহিনীর মধ্যেই নিহিত। তা বলে কাহিনী আমি বদলে দিতে নারাজ।

আমার এই আভ্যন্তরিক সঙ্কট কারো কাছে খুলে দেখানো যায় না। তোমাকে শুধু ইঙ্গিতটুকু দিলাম। তার বেশী বলব না, এখন আমি মনটাকে এই বলে তৈরি করছি: "Truth must be told. Beauty must be created." দ্বিতীয়টার উপর প্রথমটা নির্ভর করছে। যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারি তবেই সত্যকথনের বল পাব। এতদিন এটা মাথায় ঢোকেনি। ঘুম-এর এই দিনগুলি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে এখানে এসে আমার প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এবং কী করে তাকে অতিক্রম করতে হবে তারও আভাস পেয়েছি। কিন্তু সুন্দরকে সৃষ্টি করব বললেই তো সৃষ্টি করা হয় না। সাধনা চাই। সময় লাগবে। তোমরা অধীর হোয়ো না। আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের জন্যে।

ঘুম, ১২ই জুন, ১৯৫৭

॥ ৩ ॥

ইতিমধ্যে আমি আরেক বিপদে পড়েছি একখানা খামে বন্ধ চিঠি খুলে। চিঠিখানা এসেছিল জানুয়ারির গোড়ায়। খুলব কি খুলব না করে চার মাস কাটিয়ে দিলুম। কাল ওটা আমার সাম্প্রতিক চিঠিপত্রের সঙ্গে মিশে গেছল। অন্যান্য চিঠি পড়তে পড়তে ওটাও খুলে পড়লুম।

আর অমনি আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ওতে কী ছিল তোমাকে বলব না, বলা উচিত নয়। শুধু এইটুকু বলি যে 'রত্ন ও শ্রীমতী' আর বোধহয় লিখব না। যদি লিখি, আর বোধ হয় প্রকাশ করব না। ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে লিখতে পারি, কিন্তু মানুষকে বিব্রত করে ছাপাতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ হলে গল্পটা বদলে দিতেন। আমি এক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য নই। সুতরাং······বাংলা দেশের পাঠককে বলব ক্ষমা করতে।

আমার আজকালকার creed হচ্ছে ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে কাজ করা। 'কাজ' বলতে লীলাও বোঝায়। সৃষ্টি করাও লীলা। আমার এই creed আমাকে অত্যন্ত কর্মতৎপর রেখেছে ও রাখবে। বই লেখাটা বড় কথা নয়। সৃষ্টি করাটাই বড় কথা। তা যদি করতে পারি তবে প্রকাশ করা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। প্রকাশ একদিন হবেই। মহৎ সৃষ্টি দশ বিশ বছর অপ্রকাশিত থাকলে তার মহত্ত্ব হারায় না। যেমন Hopkins-এর কবিতা। কবির মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে—বোধহয় ত্রিশ বছর পরে—তার প্রকাশ ঘটে। কবি নিজে তাকে কোনোরকম গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী কাল দিয়েছে। কবি জেনেও যেতে পারলেন না যে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর কাব্য স্থিতিলাভ করল। আমারও ভাগ্য আমাকে Hopkins-এর মতো অজ্ঞাতবাসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি বেঁচে থাকতে দেখে যেতে চাই আমার সৃষ্টির প্রকাশ। এ দুর্বলতা যেদিন যাবে সেদিন আমি spiritually আরো বেশী advanced হব।

তুমি আমার সাধনা ও উপলব্ধির কথা জানতে চাও বলে জানাই। এর মধ্যে আমার এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে তোমাকে ভজাই। আমি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছিনে সাহিত্যে। আমি নিতান্তই একক। আমি আমার জীবনভর চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে

বাঁচতে। আর সেই বাঁচার অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে। এ চেষ্টা ষোলো আনা সফল না হলেও এছাড়া আর কোনো পথ আমার পথ নয়। আমার পক্ষে অপথ। বার বার পথচ্যুত হতে হতে এখন আমি আমার পথ পেয়ে গেছি। আর ক'বছর পরমায়ু জানিনে। দশ বছর, পনেরো বছর, যে ক'বছর বাঁচি নিজের পথেই চলব। আরো যশ চাইনে, আরো ধন চাইনে, আরো মান চাইনে। যা চাই তা আরো সময়, আরো নিরুদ্বেগ, আরো অব্যাঘাত। কোথায় পাই এসব? হিমালয়ে? পল্লীগ্রামে?

এবার তোমার লেখার সম্বন্ধে বলি। লেখাকে জীবিকা করে তুললে অধিকাংশের বেলা যা হয়েছে তোমার বেলাও তাই হবে। Art নয়, commercial art. দেশের সমাজব্যবস্থা বদলে গেলে সবাই লিখবে প্রচারধর্মী উপন্যাস, তুমিও তাই লিখবে। Commercial art নয়, mass entertainment-এর সঙ্গে political propaganda-র সমাহার। যদি সত্যিকারের আর্ট নিয়ে থাকতে চাও তা হলে অন্য জীবিকার সন্ধান কর। 'আর্ট' কথাটার অর্থ এখানে তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যদি মনে কর Camus-র 'Plague'-ই আর্ট, বেশ তাই হোক। কিন্তু বাংলা দেশে ওরকম বই লিখেও তুমি বাসা খরচ চালাতে পারবে না। প্রকাশকরা তোমার উপর কেবলি চাপ দিতে থাকবেন বাজার-চলতি বই লিখতে। তুমিও দাদন নিয়ে তাই সরবরাহ করতে থাকবে। শান্তিনিকেতন, ৬ই মে ১৯৫৮

পুনশ্চ: যারা ডাক্তার বা নার্স নয় তাদের পক্ষে রোগ নিয়ে নাড়া-চাড়া করা বিপজ্জনক। যারা saint নয় তাদের পক্ষে পাপ নিয়ে নাড়াচড়া করা বিপজ্জনক। তেমনি যারা সৈনিক নয় তাদের পক্ষে evil নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক। শিল্পীরা যথাসম্ভব এসব বিপদ

নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। করলে স্বধর্মচ্যুত হয়; লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তা বলে একজন মানুষ তো কেবল শিল্পীই নয়। সে কখনো কখনো saint, সৈনিক, ডাক্তার। তাই শিল্পের সঙ্গে অবান্তর অ-শিল্প জড়িয়ে যায়।

॥ ৪ ॥

"কেন বাঁচব" এ প্রশ্ন আমাকে বছরের পর বছর ভাবিয়েছে। ঐশ্বর্যের কোলে, মাধুর্যের কোলে থেকেও। টলস্টয়ের এরকম হয়েছিল। তিনি নাকি আত্মহত্যার উপকরণ সঙ্গে রাখতেন। অথচ তাঁর মতো সফল মানুষ ক'জন ?

আসলে এ প্রশ্নটা আসছে অন্যান্য মানুষের দুর্দশা দেখে, দুর্দশার অন্ত না দেখে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে সাম্যবাদী হতে তা হলে বিশ্বাস করতে যে সব দুর্দশার মূল ধনতন্ত্র, এবং ধনতন্ত্র একদিন যাবেই, সুতরাং দুর্দশা চিরদিন থাকবে না। এরকম একটা আন্তরিক বিশ্বাস যাদের আছে তারা জানে কেন বাঁচবে, যাদের নেই তারা যদি বিশ্বাস খুঁজে পায় তা হলে তারাও জানবে কেন বাঁচবে। তবে আমাদের এই ঘোর জটিল যুগে কোনো বিশ্বাসই বেশীদিন টিকতে পারে না। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ও সফল হয়েও 'কেন বাঁচব'র উত্তর দিতে না পারলে will to live শিথিল হয়ে আসে। ভিতরে ভিতরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়।

'কেন বাঁচব' মানে 'কী বিশ্বাস করব।' অন্তত কয়েকটি সূত্র ঠিক হয়ে গেলে দেখবে বাঁচার একটা হেতু মিলবে। আমার উপর দিয়ে কতবার যে কত ঝড় বয়ে গেল, এখনো যাচ্ছে, আমি বেঁচে আছি কিসের জোরে ? বিশ্বাসের জোরে। আমার জীবনে একটা লক্ষ্য আছে, সে লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে। 'তদ্ বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।' তা ছাড়া নিজের জীবনের চেয়ে বড় 'ভগবানের রাজ্য' বা সর্বোদয় বা

সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বা ন্যায়াচরণ। "Seek ye the Kingdom of God and all these shall be added unto you." এইসব সূত্র আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শান্তিনিকেতন, ১০ই জুন ১৯৫৮

শত বর্ষ পূর্বে

পলাশীর শত বর্ষ পরে ভারতের দিকে দিকে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে আরো একশ' বছর পরে আমরা তার স্মৃতি পালন করছি। আমাদের রাজনীতিকরা ধরে নিয়েছেন যে সেটা ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমর, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা সকলে একমত নন। তাঁদের কারো কারো প্রতিবাদ শুনে মনে হয় স্বাধীনতা সমর কথাটা অতিবাদ।

তা হলে ওটা কী? মিউটিনি? মিউটিনি তো স্থলসৈন্য বা জলসৈন্যরা করে বলে জানি। দিল্লীর বাদশা, ঝাঁসীর রানী, নানাসাহেব, কুঁওর সিং—এঁরা কোন্ দুঃখে মিউটিনি করবেন? তবে কি ওটা বিদ্রোহ? বিদ্রোহ তো রাজাদের বিরুদ্ধে প্রজারা করে, প্রভুদের বিরুদ্ধে ভৃত্যরা করে। দিল্লীশ্বর কি কারো প্রজা ছিলেন? কার প্রজা? ইংলণ্ডেশ্বরের বা ইংলণ্ডেশ্বরীর? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর? গভর্নর জেনারেলের? সিপাহীরাও কি এঁদের কারো প্রজা ছিল? হিন্দুস্থানের জনসাধারণও কি ছিল এঁদের কারো প্রজা?

এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে, দিল্লীশ্বর ছিলেন হিন্দুস্থানের আইন-অনুসারে রাজা। রাজার কাছে দেওয়ানী নিয়ে এক বিদেশী সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কার্যত রাজার কাজ করছিল। সেই প্রতিষ্ঠানেরই এক

কর্মচারী গবর্নর জেনারেল। কোম্পানী ও তার বিদেশী কর্মচারীরা ছিল ব্রিটিশ সাবজেক্ট বা ব্রিটিশ রাজের প্রজা। আর কোম্পানীর দেশী কর্মচারীরা ছিল হিন্দুস্থানের বাদশার প্রজা। সিপাহীরাও যে ব্রিটিশ সাবজেক্ট ছিল তা নয়। ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি তাদের লয়ালটি থাকার কথা ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য এক জিনিস নয়। প্রভুভক্তি ও রাজভক্তি দুই স্বতন্ত্র ভক্তি। গুর্খারা ইংরেজের চাকরি করে। তারা প্রভুভক্ত, কিন্তু তাদের রাজভক্তির পাত্র ব্রটিশ রাজ নন, নেপাল রাজ। নেপালের সঙ্গে ব্রিটিশের দ্বন্দ্ব বাধলে তারা নেপালের দিকে ঝুঁকবে।

সিপাহীরা যদি জানত যে তারা ব্রিটিশ রাজের প্রজা তা হলে তারা রাজদ্রোহী হতো কি না সন্দেহ। তাদের জ্ঞানত তারা রাজদ্রোহী হয়নি। হয়েছে প্রভুদ্রোহী। তাও অনেক দিন সহ্য করার পর। আর তাদের এই প্রভুদ্রোহ ছিল তাদের প্রকৃত রাজা ও রাজন্যদেরকে বিদেশী দেওয়ান প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে উদ্ধার করার আশায়। যে প্রভু সে রাজা নয়। যে রাজা সে প্রভু নয়। এই যে anomaly সিপাহীরা চেয়েছিল এর একটা হেস্তনেস্ত। তাদের বিচারে হেস্তনেস্তটা হবে প্রভুকে রাজা না করে রাজাকে প্রভু করে। তাদের চ্যালেঞ্জের ফলে একটা হেস্তনেস্ত হলো বইকি। প্রভু রাজা হলো না, রাজা প্রভু হলো না, প্রভুত্ব গেল, রাজত্ব গেল, মুঘল বাদশা বাহাদুর শা'র স্থলে ভারতের সিংহাসনে বসলেন ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া। দেশসুদ্ধ লোক হয়ে গেল ব্রিটিশ সাবজেক্ট। "প্রথম স্বাধীনতা সমরে"র পরিণাম হলো প্রথম পরাধীনতা।

খুব অদ্ভুত! না? রানী ভিক্টোরিয়া যখন আমাদের মহারানী ছিলেন না তখন আমরা তাঁর প্রজা ছিলুম না। আমরা যে তাঁর দেশের

একটি বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রজা ছিলুম তাও নয়। কিংবা ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী গবর্নর-জেনারেলের প্রজা ছিলুম তাও নয়। প্রজা ছিলুম আমরা হিন্দুস্থানের বাদশার। যারা বাদশাকে অস্বীকার করেছিল তারা ছিল কার প্রজা জানিনে, কারণ তত দিনে পঞ্জাব ও মরাঠা রাজ্যগুলি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন হয়েছে। সেটাও একটা anomaly. বাদশাকে যারা মানে না, কাকে যে তারা রাজা বলে মানবে তাও বোঝা দায়। ব্রিটিশ রাজকে নয় নিশ্চয়ই। এই anomaly-র হেস্তনেস্ত হলো মুঘল মরাঠা শিখ রাজপুত রাজা বাদশাকে রাজভক্তির পাত্র না করে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে রাজভক্তির একমাত্র আধার করে। তিনি ইংলণ্ডের রানী। সেইসূত্রে ইংলণ্ড আমাদের রাজার দেশ। আর ভারতবর্ষ ও-দেশের রাজার সাম্রাজ্য। আইন-অনুসারে আমরা সম্রাজ্ঞীর প্রজা হলুম। আমাদের দেশ হলো পরাধীন।

তার আগে যে পরাধীনতা সেটা কার্যত পরাধীনতা হলেও আইনত নয়। ভারতেশ্বর বলতে একজনকেই বোঝাত। তিনি দিল্লীর বাদশা। কেউ তাঁকে অস্বীকার করেনি, সিংহাসনচ্যুতও করেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও না; ইংলণ্ডের রাজাও না। তাঁকে তাঁর স্বস্থানে রেখে তাঁর ক্ষমতা হস্তগত করার নাম রাজার রাজত্ব কেড়ে নেওয়া নয়। নেপালের সেনাপতি রাজার ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। তা বলে রাণা বংশ রাজ বংশ হয়ে যায়নি। প্রজারা রাজার প্রজা না হয়ে রাণার প্রজা হয়ে যায়নি। পরে একদিন রাণাবংশকে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন রাজাই আবার রাজ-ক্ষমতা ফিরে ফেলেন। সেইরকম একটা ব্যাপার ঘটত ১৮৫৭-এর বিক্ষোভ সফল হলে। বাদশাই রাজক্ষমতা ফিরে পেতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মরাঠা রাজারা।

সে বিক্ষোভ যে সফল হলো না এর একটা বড় কারণ সেটা নেপালের মতো গণবিক্ষোভ বা প্রজাবিক্ষোভ নয়। সেটা নিতান্তই

একটা প্রভুভৃত্যের ব্যাপার হিসাবে শুরু হলো। তার পরে পর্যবসিত হলো রাজা রাজড়াদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টায়। সে চেষ্টা বিদেশীর বিপক্ষে বলে যে স্বদেশীয়দের স্বপক্ষে এ ধারণা সাধারণের ছিল না। কারণ রাজারা ক্ষমতা ফিরে পেলে প্রজারা যে সে ক্ষমতার শরিক হবে এ রকম কোনো অঙ্গীকার বা আশ্বাস কেউ তাদের দেয়নি। নেপালে সেটা ধরে নেওয়া হয়েছিল। সেটা ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাই প্রোডাক্ট।

জনগণের লাভবান হবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা অত্যধিক। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক হাতে শোষণ করলেও অন্য হাতে শাসন যা করছিল তা অপেক্ষাকৃত সুশাসন। ভারতের লোক হাজার হাজার বছর পরে সেই প্রথম "rule of law" কাকে বলে তার স্বাদ পায়। ভারতের ইতিহাসে বহু সদাশয় রাজা প্রজারঞ্জন করেছেন, কিন্তু তার ফলে খেয়ালখুশির শাসন গিয়ে আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়নি। প্রজাদের পঞ্চায়তরা হয়তো সুবিচার করেছে, কিন্তু অবিচার করলে তার উপর কোন আপীল ছিল না। ভারতের জনসাধারণ শুনে অবাক হলো যে ক্লাইভকেও সামান্য কয়েক লাখ টাকার জন্যে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, অথচ কোটি কোটি টাকার জন্যে কেউ কোনোদিন স্বদেশীয় শাসকদের কাছে জবাবদিহি চায়নি বা চাইতে সাহস করেনি। আরো অবাক হলো যখন শুনল ওয়ারেন হেস্টিংসকে পার্লামেণ্টের সভ্যরা impeach করছেন। তা হলে সর্বশক্তিমান নন ভারত-ভাগ্যবিধাতা গবর্নর জেনারেল। পরে যখন খবর পেলো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা ইংলণ্ডেশ্বরও সর্বশক্তিমান নন, তিনিও পার্লামেণ্টের দাপটে একবার মুণ্ডু হারিয়েছিলেন ও তাঁর সিংহাসনে প্রজানায়ক ক্রমওয়েল বসেছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরবর্তী কালে "constitutional monarch" হয়ে প্রজার ইচ্ছায় রাজ্য চালান—তখন

তাদের বিস্ময় চরমে ঠেকল। তারা "ধন্য ধন্য" করল। এমন নিয়মের রাজত্ব যে দেশের সে দেশের কাছে আবেদন নিবেদন করলে সুবিচার পাওয়া যাবেই এ বিশ্বাস দীর্ঘ এক শত বর্ষ ধরে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তাই সিপাহীরা কেন সুবিচারের জন্যে পার্লামেণ্টের দ্বারস্থ না হয়ে তরবারির সাহায্য নিয়েছিল সাধারণ লোক তা বুঝতে পারেনি। আর পার্লামেণ্ট না থাকলে রাজা বাদশাদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসার পর কার কাছে তাঁদের অবিচারের বিরুদ্ধে দরবার করবে তাও বুঝে উঠতে পারেনি তারা।

নিয়মের রাজত্বে যাদের বাস তারা যে নিতান্ত নিরাশ ও মোহমুক্ত না হলে অরাজকতা ডেকে আনবে না এটা সিপাহীদের বা তাদের পিছনে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের খেয়াল ছিল না। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৌবলে বলীয়ান ব্রিটিশ রাজশক্তি পিছনে থাকতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে জিতবে কে? লোকে এ প্রশ্নের উত্তর পায়নি বা পেলেও বিশ্বাস করেনি। একটু আগেই তো ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার সর্বশক্তিমান জার পর্যন্ত হেরে গেলেন। কোম্পানীর পিছনে ছিল সেকালের দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য। যে ঘোড়া হারবেই তাকে বাজী ধরবে কে?

শুধু "military sanctions" নয়, "moral sanctions" ছিল বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে। তারা ধর্মে নিরপেক্ষ তো ছিলই, তাদের হাতে ধন প্রাণ ও ইজ্জৎ নিরাপদ ছিল। পলাশীর একশ' বছরের মধ্যে ইংরেজরা সবসুদ্ধ ক'জন ভারতীয় বধ করেছিল? বড় জোর বিশ হাজার। তাও যুদ্ধকালে বা আদালতের বিচারে। মানুষ মেরে আইনের আমলে আসেনি, আইনের ঊর্ধ্বে রয়েছে, এমন একজনও ইংরেজ ছিল না। তেমনি নারীনিগ্রহ করলে ইংরেজেরও বিচার ছিল, দণ্ড ছিল। জাতির নামে যাতে কলঙ্ক না লাগে তার জন্যে গোরা

সিপাহীদেরও সামরিক আদালতে পাঠানো হতো, খুব কম সাজা হলেও দেশান্তরিত করা হতো। একটা না একটা প্রতিকার এখানে না হোক বিলেতে পাওয়া যাবেই, এ বিশ্বাস যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর ছিল। অন্যায়কে রাজপুরুষরা প্রশ্রয় দেবেন না, সমর্থন করবেন না, রাজপুরুষরা অন্ধ হলেও রাজা স্বয়ং অন্ধ হবেন না, দুর্যোধনের দুষ্কর্মে ধৃতরাষ্ট্রের মতো সহায় হবেন না, এ বিশ্বাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের অন্তরে অবিচল ছিল। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের আগে দু'চার জনের বিশ্বাস হয়তো টলেছিল, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস টলেনি। "Moral sanctions" অদৃশ্য হতে আরম্ভ করল তখন থেকেই।

সিপাহী বিক্ষোভে ইংরেজরা কম অত্যাচার করেনি, কিন্তু সেটা যুদ্ধকালে ঘাত প্রতিঘাতের সামিল। সেটা প্রতিশোধ বলে গণ্য হবার যোগ্য। তার জন্য তারাও পরে লজ্জিত হয়েছিল। তাদের অনুতাপ হতে এলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার অপসারণ, সেকালের শাসক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন, ইণ্ডিয়ান আর্মির রদবদল, রাজাদের উপর খোদকারী বন্ধ। অপর পক্ষে সমাজ সংস্কার কার্যে সরকারের উৎসাহ রইল না, রক্ষণশীলদের তোয়াজ করাই হলো শাসকদের আত্মরক্ষার উপায়। ক্রমে ক্রমে এলো ভেদনীতি (divide and rule)। ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি বদলে গেল।

মহারানী ভিক্টোরিয়া বাহাদুর শা'কে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লোক রাতারাতি ব্রিটিশ সাবজেক্ট বনে যায়। পরাধীনতার এই জাজ্বল্যমান উপলব্ধি থেকে এলো ভারতীয় জাতীয়তার চেতনা। এর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। স্বাধীনতার বাসনা জাগল। বাসনা থেকে এলো সংগ্রাম। সংগ্রাম থেকে এলো স্বাধীনতা। প্রথম স্বাধীনতার সমর ১৮৫৭ সালে ঘটেনি,

কেননা তৎপূর্বে পরাধীনতাই আইনসম্মত হয়নি, পরাধীনতাবোধই উপজাত হয়নি, স্বাধীনতার বাসনাই জাগরিত হয়নি। ১৮৫৭ সালে যা ঘটেছিল তাকে যদি মিউটিনি বা বিদ্রোহ বলতে আপত্তি থাকে তবে বলব বিক্ষোভ বা সংঘর্ষ বা যুদ্ধ। "সিপাহীযুদ্ধ" কথাটা অপ্রযুক্ত নয়।

সেটার হেতু নিশ্চয়ই ছিল। সেটা অগৌরবেরও নয়। তার স্মৃতি পালন করাও সঙ্গত। যে যুদ্ধ সফল হলে স্মরণীয় হতো তা বিফল হয়েছে বলে বিস্মরণীয় নয়। কিন্তু তাকে স্বাধীনতা সমর বলা সত্যের অপলাপ। সুতরাং প্রথম স্বাধীনতা সমর বলা অযথা। তা যদি স্বাধীনতা সমর হয়ে থাকে তবে মুঘল ও মরাঠা রাজশক্তির শেষ স্বাধীনতা সমর। বাহাদুর শা'র সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান বাহাদুরও পদচ্যুত হলেন। সুতরাং ওটা কোম্পানী বাহাদুরেরও শেষ স্বাধীনতা সমর। (১৯৫৭)

সংস্কৃতি কোন্ পথে

কথাটা আসলে কালচার। ভাষান্তরিত হয়ে প্রথমে হয় কৃষ্টি। মিষ্টি শোনায় না বলে তার পরে হয় সংস্কৃতি। এত দিনে আমরা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়েছি। তার গায়ে কেমন 'সংস্কৃত-সংস্কৃত গন্ধ। মনে হয় সংস্কৃতেরই মতো সুপ্রাচীন তার কুলজি। তা নয়। এই শব্দটি বছর বিশেক হলো চালু হয়েছে। তার আগে ছিল কৃষ্টি। তারও আগে কালচার বা কালচারবাচক বিভিন্ন প্রতিশব্দ।

কালচার ও কালটিভেশন একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন। তেমনি কৃষি ও কৃষ্টি। কৃষ্টির ভিতর একটা কর্ষণের ভাব আছে। মৃত্তিকাকে প্রতি বছর কর্ষণ করতে হয়। তেমনি মানব-জমিনকে প্রতি নিয়ত আবাদ

করতে হয়। নইলে সোনা ফলে না। বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রমে দেবস্থানে চিত্রশালায় রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীতের আসরে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে দার্শনিকের পাঠাগারে সাহিত্যিকের চায়ের আড্ডায় তার্কিকদের কফি-হাউসে সমজদারদের ঘরোয়া বৈঠকে মহিলাদের মজলিসে সম্পাদকদের দরবারে মন-জমিনের কর্ষণ নিত্য নিয়মিত চলেছে। কোথাও যারা যায় না তারাও ঘরে বসে বই নিয়ে বেহালা নিয়ে ঐ অর্থে কৃষিকাজ করে।

সংস্কৃতির মধ্যে কর্ষণের ভাব নেই। উৎকর্ষ অপকর্ষের দ্যোতনা নেই। কর্ষণ গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে। ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে পারে। সংস্কৃতি সে রকম কোনো ব্যঞ্জনা বহন করে না। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করবার আগে মানুষ আরণ্যক ছিল। তখন তার সংস্কৃতি বলতে বিশেষ কিছু না। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি এলো। সুতরাং কৃষির সঙ্গে সংস্কৃতির সোদর সম্পর্ক। এর স্বীকৃতি সংস্কৃতি শব্দের মধ্যে নেই, কৃষ্টি শব্দের ভিতর আছে। কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে সংস্কৃতির পরিণাম হবে আকাশকুসুমের মতো। কিংবা কাগজের ফুলের মতো। কলকারখানার যুগে সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মৃত্তিকাচ্যুত হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার মতো সে হয়তো একদিন শিকেয় তোলা হবে।

এইসব কারণে কালচারের ভাষান্তর সংস্কৃতি না হয়ে কৃষ্টি হলেই যথার্থ হতো। কিন্তু ওটা সত্যি শ্রুতিকটু। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে কবিগুরু ওটাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সংস্কৃতি চালু হবার পর কৃষ্টি চালানো যায় না। সংস্কৃতিই চলবে। শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কৃষির মতো ওটা ধুলো-কাদামাখা আটপৌরে ঘেমো কাপড়। ফ্যাশনদুরস্ত শৌখান পোশাক নয়। সংস্কৃতির কাজ যারা করে তারা চাষীর জাতভাই। তারা তেতলার ছাদে টবে ফুল ফুটিয়ে সাধ মেটায় না।

এক হিশাবে সংস্কৃতি কথাটাও ভালো। যেমন প্রাকৃত থেকে সংস্কৃত তেমনি প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতি। এর মূল নিহিত রয়েছে প্রকৃতির ভিতরে। সংস্কৃতি প্রকৃতির থেকে উদ্ভূত, অথচ প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, প্রকৃতির বিকৃতি নয়, প্রকৃতির বিপরীত কৃতি নয়। প্রকৃতিকে স্বস্থানে রেখে, প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে সম্যক কৃতি। তথা নবীন কৃতি।

সংস্কৃতির কাজ যারা করে তারা এক হাতে জীর্ণসংস্কার করে, অপর হাতে নতুন সৃষ্টি করে। পুরাতনের সঙ্গে, জরার সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব অবিশ্রাম ও অবিরত। একই কালে তারা অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত। তারা সর্বক্ষণ আপ-টু-ডেট। তারা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে মুখ করে লাঙল দেয়। তারা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকালেও পশ্চাতের আকর্ষণে কর্ষণের মোড় ফেরায় না। তাদের ফসল সদ্যোজাত। প্রকৃতির মতোই তারা নিত্য নতুন। যদিও প্রকৃতির থেকে সর্বদা এক পা এগিয়ে থাকাই তাদের স্বভাব।

প্রকৃতি মানুষকে যা দিয়েছে মানুষ তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, নিজের ইচ্ছামতো আরো কিছু বানিয়ে নিয়েছে। এমনি করেই তার সভ্যতা। এমনি করেই তার সংস্কৃতি। দুটো শব্দই মোটামুটি এক। কিন্তু পুরোপুরি এক নয়। সভ্যতার ঝোঁকটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। আর সংস্কৃতির ঝোঁকটা সত্য অন্বেষণের উপরে, সৌন্দর্যধানের উপরে, শ্রেয়ঃ নির্ধারণের উপরে। সভ্য দেশ বলে পরিচয় দেয় এমন দেশ আছে মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে যার দান অতি সামান্য, রূপভাণ্ডারে যার দান অতি নগণ্য। যে দেশে বিবেকের মূল্য নেই, যে দেশ থেকে বিবেকীরা নির্বাসিত, অথবা কারারুদ্ধ—ইতিহাসে এমন সভ্যতার নজির আছে যা সংস্কৃতিকে এক কদমও এগিয়ে দেয়নি। অপর পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্পসভ্য দেশও সংস্কৃতিতে অধিক অগ্রসর হতে পারে।

তেমন একটি দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সারা মানবজাতির অগ্রগতি। কেউ যদি চলতে চলতে আলো দেখতে পায় সে আলো সবাইকে পথ দেখায়। সভ্যতা বলতে সেকালের ইহুদীদের কতটুকুই বা ছিল! অথচ তাদেরই ঘরে জন্মালেন যীশু। আর সমস্ত মানুষকে আলো দিয়ে গেলেন। তার আগে শাক্য উপজাতির ঘরে জন্মেছিলেন সিদ্ধার্থ। তার পরে মরুচারী আরবদের ঘরে জন্ম নিলেন মুহম্মদ। তখনকার দিনে সভ্য জাতি হিশাবে এসব জাতির খ্যাতি ছিল না। তবু সংস্কৃতির দিক থেকে এদের দান অতি মূল্যবান।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সব মানুষ ভাগ করে ভোগ করতে পারে না, তাই সভ্য দেশের পাশেই অসভ্য দেশ দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি সকলে মিলে ভোগ করতে পারে। একখানা রুটি একটি মানুষের ক্ষুধা মেটায়, কিন্তু একটি গান লক্ষ লক্ষ মানুষের আনন্দ বিধান করে। এইখানে সভ্যতার উপর সংস্কৃতির জিত। কৃষিকাজের উপর কৃষ্টিকর্মের জিত। দেশের সীমানা, কালের ব্যবধান, ভাষার বাধা সব কিছুকেই অতিক্রম করে দার্শনিকের চিন্তা বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার সাহিত্যিকের কল্পনা চিত্রকরের দৃষ্টি সঙ্গীতকারের সুর ভাস্করের সৃষ্টি। সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদ বা শ্রেণীস্বার্থবাদ সংস্কৃতির প্রেরণা হলে সর্বনাশ। তেমনি ধর্মান্ধতা বা বর্ণান্ধতা যদি প্রেরণা যোগায় তবে মহতী বিনষ্টি। মধ্যযুগের ইউরোপের সংস্কৃতি আপনাকে ক্ষয় করে এনেছিল বলে রেনেসাঁসের প্লাবনে ভেসে গেল। তেমনি মধ্যযুগের ভারতের সংস্কৃতি ভেসে যেতে আরম্ভ করে গত শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষার জোয়ারে। সে জোয়ারে এখনো ভাঁটা পড়েনি স্বাধীনতার পরেও।

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় তাকে দুর্বল করে এনেছিল। সে দুর্বলতা পরাধীনতার ফলে নয়। তাই পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়নি। বরং পরাধীনতাই তার ফলে। তার গোড়ায়

ছিল এবং আছে প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলের একান্ত অভাব। যে প্রকৃতি দিনে দিনে নতুন, যুগে যুগে নতুন, তাকে নিয়ে আমরা বড় জোর একটু কাব্যি করি। তার নিয়মকানুন জানতে যাইনে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সমাজের নিয়মগুলো মিলিয়ে নিইনে। আমাদের সংস্কৃতি প্রকৃতিবিমুখ। প্রকৃতির বিপরীত কৃতিকেই আমরা মনে করি সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতির পায়ের তলায় রিয়ালিটি নেই। তার স্থান নিয়েছে ঐতিহ্য বা শাস্ত্র। সে ঐতিহ্যের পায়ের তলায়ও রিয়ালিটি নেই। আর সে শাস্ত্র তো রিয়ালিটি থেকে সহস্র যোজন দূরে। সেকালের ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনপুস্তক একালের অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার দিয়ে শোধিত হয়নি। কারো সাধ্য নেই যে শোধন করে। আমাদের মধ্যে যাঁরা পরম বিদ্বান তাঁরাও সাহস পান না সত্যের ভুল ধরতে। তাঁরা বড় জোর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ধরিয়ে দেন। কিংবা নতুন একটা ব্যাখ্যা দেন, যা একালের মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। গীতাভাষ্য অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু গীতার সমালোচনা একজনও না।

এক কথায় রেনেসাঁস অতীতের উত্তরাধিকারকে বাজিয়ে দেখতে ভয় পায়। ভালো-মন্দ খাঁটি-মেকি সার-অসার সবই তার কাছে রক্ষণ-যোগ্য, যেহেতু পুরাতন। তা হলে একে রেনেসাঁস বলা হয় কেন? বলা হয় এইজন্যে যে বিদেশের ধাক্কায় দেশময় একটা জাগরণের সাড়া পড়েছে এবং গত দেড়শ' বছরে নতুন কাজ দেদার হয়েছে। কিন্তু তা হলেও কাজের কাজ এখনো হয়নি। আজকের দিনের রিয়ালিটির সঙ্গে কালকের দিনের উত্তরাধিকারকে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি। এখনো আমাদের মনের ধাঁচটা প্রকৃতিবিমুখ। প্রকৃতির বিপরীতকৃতি এখনো আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়। অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃতকেই যারা ধর্ম বলে বিশ্বাস করে ইনটেলেকচুয়ালরাই দেখছি তাদের মহাভক্ত। তা হলে রেনেসাঁসের দায় বহন করবে কে? না, সত্যিকারের ইনটেলেক-

চুয়াল আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। আছে কতকগুলি অন্ধবিশ্বাসী নয়তো কূটতার্কিক। আর শিল্পী যারা আছে তাদেরও প্রেরণা ফুরিয়ে আসছে। কারণ প্রাচীন কীর্তি তো অফুরন্ত নয়, লোকশিল্পও নয় অপরিশেষ। এখন সোজাসুজি প্রকৃতির কাছে যেতে হবে, রিয়ালিটির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। নয়তো নতুন কাজ যা হবে তা খবরের কাগজের মতো নতুন। পরের দিনই বাসি। সত্যিকার নূতনত্ব হচ্ছে অভিজ্ঞতার নূতনত্ব। জীবনদর্শনের নূতনত্ব।

গত শতাব্দীর তুলনায় আমাদের জীবন অনেক বেশী বিচিত্র অনেক বেশী জটিল হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক রাস্তা খুলে গেছে। শহরের আয়তন ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গ্রামে গেলেও শহরের প্রভাব এড়ানো যায় না। কৃষিপ্রধান দেশ ক্রমে ইণ্ডাস্ট্রিবহুল হয়ে উঠছে। আরো পঞ্চাশ বছর পরে যখন একবিংশ শতাব্দীতে পড়বে তখন তার রকমটা হবে শহুরে। বাইয়ের ধাক্কার আর দরকার হবে না। ভিতরের ধাক্কাতেই সে ইঞ্জিনের মতো বেগবান হবে। তখন তার সমস্যাগুলো ঠিক আজকের মতো থাকবে না। কিন্তু কালকের মতো বলতে কী বোঝায় তা আমার পক্ষে অনুমান করা শক্ত। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আবহমানকাল যারা চাকার নিচে পড়ে রয়েছিল তারা চাইবে চাকার উপরে উঠতে। বাধা পেলে হাঙ্গামা বাধাবে। সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা যাবে না। সংস্কৃতিকে যদি কেউ ভোলানোর কাজে লাগায় তা হলে সংস্কৃতির মর্যাদা ধুলায় লুটাবে।

জনগণের জীবনে জাগরণ আসবেই। তাকে মেনে নিয়ে সুপথে চালিয়ে নিয়ে গেলেই সবচেয়ে কম অনর্থ। নেতৃত্ব এখন অবধি ইংরেজী-শিক্ষিত ইংরেজী মূল্যজ্ঞানে জ্ঞানী মধ্যবিত্তশ্রেণীর নাগরিকদের হাতেই রয়েছে। আরো অনেক দিন থাকবে, যদি ক্ষমতার অপব্যবহার না

ঘটে। যদি ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে মরচে ধরে ক্ষয়ে না যায়। অপব্যবহার ও অব্যবহার দুটোই খারাপ।

সব চেয়ে দুর্লক্ষণ যা দেখছি তা নরম জীবনের মোহ। বুড়োদের মতো আরাম খোঁজা। যাদের বয়স অল্প তারা কোথায় দুরূহ সাধনার ও দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের আয়োজন করবে। তা নয়। সস্তায় কিস্তিমাত করে রাতারাতি সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। যা লিখবে তার থেকে হাতে হাতে ধন আসবে, যশ আসবে, মান আসবে, অথচ তা উচ্চমার্গের সাহিত্য হবে, কোটি কোটি লোকের অক্ষয় উত্তরাধিকার হবে। এটা একপ্রকার সম্মোহন। যাদের অন্ধ করেছে এ মোহ তারা যদি অপরকে পথ দেখাতে যায় তবে সেটা হবে অন্ধেন নীয়মাণঃ যথা অন্ধঃ। নেতৃত্ব এমনি করেই হাত থেকে খসে পড়ে। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আগের মতো মান্য করে না লোকে। ওরা কেমন করে টের পেয়েছে যে এরাও অন্ধ।

আর একটা দুর্লক্ষণ সংস্কৃতিকে ভোলানোর কাজে লাগানো। এটা কেউ ইচ্ছা করে করছে কিনা জানিনে, কিন্তু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এটা হচ্ছে। এই যে যত্র তত্র নৃত্যগীত সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভুঁই ফুঁড়ে উঠছে, এই যে পথে ঘাটে সুলভ সিনেমার ব্যাঙের ছাতা গজাচ্ছে, এতে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে না। এ হচ্ছে ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর গান ও গল্প। ডেকাডেন্সের সময় এ রকম দেখা যায়। এর থেকে মনে হতে পারে আমাদের রেনেসাঁস স্বল্পায়ু। কেউ কেউ এমন ধারণায় উপনীত হয়েছেনও। যাদের নবজন্ম সবে সেদিন হলো তারা যদি একশ' দেড়শ' বছরে বুড়িয়ে যায় তা হলে ওটা কি সত্যি নবজন্ম না কায়কল্প? ভারতের মতো বৃহৎ দেশের নবজন্ম বহু শতাব্দীর পর এসেছে, যায় যদি বহু শতাব্দীর পর যাবে। আমার তো মনে হয় না যে

এটা কায়কল্প অথচ এই ডেকাডেন্স এত বেশী প্রকট যে একে রেনেসাঁসের সঙ্গে মেলানো কঠিন। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপারও নয়। কোটি কোটি লোক পতঙ্গের মতো ছুটেছে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখতে। সেখানে পতঙ্গের মতো মরতেও। তাদের মধ্যে আছেন বিলেতফের্তারাও। এঁরা পায়ে হেঁটে পুণ্যসঞ্চয় করলে পারতেন। বাষ্পায়যানের উদ্ভাবন হয়নি এইসব প্রাগৈতিহাসিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। আধুনিক বিজ্ঞানকে এঁরা অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারে লাগিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই অপব্যবহারও একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

আমাদের সামনে কাজ রয়েছে বিস্তর। সে কাজ সংস্কৃতির ঘরের কাজ। তার উপর যদি রাজনীতির বা অর্থনীতির কাজ করতে চাই সেটা হবে সংস্কৃতির বাইরের কাজ। একই সঙ্গে দুই ধরনের কাজ করতে গেলে অবহেলা অনিবার্য। সেইজন্যে বাইরের কাজ অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘরের কাজ করাই সুবুদ্ধি। ঘরের কাজ বলতে আমি বুঝি সংস্কৃতিকে রিয়ালিটির সঙ্গে সম্পর্কসমন্বিত করা। আর রিয়ালিটি বলতে আমি বুঝি যা আপাত দৃশ্যমান তাই নয়, যা তার আড়ালে রয়েছে। আর সংস্কৃতি বলতে আমি বুঝি রাশি রাশি পাঠ্য বা শ্রাব্য বা দর্শনীয় পদার্থ নয়। যাতে কর্ষণের স্থান আছে। প্রকৃতির এক ধাপ উপরে। যা ভোলায় না। যা লক্ষ্মীলাভের উপায়মাত্র নয়।

গোটা দুই মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর আজ কেউ জোর করে বলতে পারছে না যে প্রগতির পথ মসৃণ। প্রগতি অনেক সময় বক্রগতি ও পশ্চাৎগতিতে পরিণত হয়। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। সুতরাং সব রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকা ভালো। সুলক্ষণ যে আদৌ লক্ষিত হচ্ছে না তা নয়। বিহারের এক অখ্যাত

গ্রামে একবার দার্শনিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা কেবল যে অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করল তাই নয়, তাঁদের কথা মন দিয়ে শুনল এবং তাঁদের কাছে জানতে চাইল পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিকতম তত্ত্ব। এরা অতি সাধারণ লোক। শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারে না। তবু এদের মন সজীব ও গ্রহিষ্ণু। বিহার সম্বন্ধে যা সত্য অন্যান্য প্রান্ত সম্বন্ধেও তাই সত্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে গ্রামের লোক মনের মতো নেতৃত্ব পাচ্ছে না। নেতৃত্বের জন্যে তারা ব্যাকুল। নেতৃত্ব পেলে তাদের চিন্তার ও কল্পনার অপূর্ব স্ফূরণ হবে হবে। বলা বাহুল্য নেতৃত্ব মানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়। নেতৃত্ব যারা করবে তাদের মূল্যজ্ঞান নিখুঁত হওয়া চাই। ইংরেজী মূল্যজ্ঞানও বহু অংশে অপূর্ণ। ইংরেজী মূল্যজ্ঞান যাকে বলছি তা ইংরেজ বা ইংরেজীর মারফত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল্যজ্ঞান। আমাদের দেশেও রেনেসাঁসের দরকার ছিল বলেই ইংরেজী মূল্যজ্ঞানের দরকার হয়েছিল। সে রেনেসাঁস এখনো দরকারী, তাই ইংরেজী মূল্যজ্ঞান ইংরেজ না থাকলেও দরকারী, ইংরেজী না থাকলেও দরকারী। জাতীয়তাবাদীদের এটা সমঝানো শক্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে ইংরেজী মূল্যজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন্‌খানে তার অপূর্ণতা এতদিনে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়েছে। সেটা ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই অপূর্ণতা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তাকে শক্তিতে ভাঙিয়ে নিয়েছে। মানুষকে করেছে মহাশক্তিমান। কিন্তু মানুষের চরিত্র যেখানে ছিল সেইখানেই রয়ে গেছে। শিশুর হাতে পিস্তল দেওয়া বিপজ্জনক। চোর ডাকাত খুনীর হাতে বাষ্প বিদ্যুৎ পরমাণু দেওয়া আরো বিপজ্জনক। মডার্ন সভ্যতাকে মরাল সভ্যতা না করলে এর সমাপ্তি অপঘাতে। তার মানে কিন্তু মডার্নকে প্রিমিটিভ

করা নয়, মধ্যযুগীয় করা নয়। মডার্নকে মডার্ন রাখতেও হবে, মরাল করতেও হবে। আমাদের দেশে গান্ধীজী যা করে গেছেন, বিনোবাজী যা করে যাচ্ছেন তা নৈতিকতার আদর্শ। কিন্তু এঁদের কাজও অপূর্ণ, কারণ এঁরা মধ্যযুগীয়কে আধুনিক না করে আধুনিককে মধ্যযুগীয় করার পক্ষপাতী, নইলে তাকে নৈতিক করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম। এ রকম একটা সমাধান যদি মানি তবে রেনেসাঁসের কোনো মানে হয় না। আমরা কি তবে গত দেড়শো বছর ধরে আলেয়ার পিছনে ছুটেছি? আলো পাইনি বিজ্ঞান থেকে, ইতিহাস থেকে, নব্য দর্শন থেকে, নব্য সাহিত্য থেকে? ফরাসী বিপ্লবের মূলসূত্র থেকে? রুশ বিপ্লবের মূলসূত্র থেকে? ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র ও আইনের মূলসূত্র থেকে? আলো পেয়েছি বই-কি। যে আলো নিবিয়ে দিতে রাজী নই। বরং তাকে আরো উজ্জ্বল করতে চাই। অন্ধকারে ফিরে যাওয়া বা অন্ধ হওয়া ভারতের জনগণের পক্ষে ভালো নয়। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় ও দেশবিভাগে আমরা এটা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি।

তা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানব-প্রকৃতিকে অশুদ্ধ রেখে মানবের হাতে ঈশ্বরের ক্ষমতা দিলে সে দানবিক কাণ্ড করবে। দু'দুটো মহাযুদ্ধ তার দানবিকতার শেষ কথা নয়, তৃতীয় একটার প্রস্তুতি চলেছে। প্রত্যক্ষ করছি কেবল ইংরেজী মূল্যজ্ঞান যথেষ্ট নয়। সত্য ও অহিংসা একান্ত আবশ্যক। গান্ধী ও বিনোবা অত্যন্ত দরকারী কাজ করেছেন ও করছেন। ভারতের মাটিতে তাঁরা সত্য ও অহিংসার আবাদ করে সোনা ফলিয়েছেন ও ফলাচ্ছেন। আমাদের রেনেসাঁস যদি সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয় তা হলে ভারতের জনগণ তার অপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করবে। মডার্ন হওয়া তাদের চাই, নইলে তাদের বাস্তব দৃষ্টি খুলবে না। মরাল হওয়াও তাদের চাই, নইলে তারা মহাশক্তিমান হয়ে ইউরোপের মতো সে শক্তির দানবিক ব্যবহার করবে।

আমরা এমন একটা সম্পূর্ণতার স্বপ্ন দেখব যা মধ্যযুগে বা আদিযুগে ফিরে যাবার বা তাকে ফিরিয়ে আনবার স্বপ্ন নয়। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের হিংসা ও মিথ্যার চোরাবালির উপর গড়া কুবেরপুরীর স্বপ্নও নয়। আমাদের ভাবী সংস্কৃতি হবে একাধারে মডার্ন ও মরাল। এক হাতে সে পশ্চাৎপদদের অন্ধতা দূর করবে, অন্য হাতে শক্তিমত্তদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। এক দল লোককে নিয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোয়। আরেক দল লোককে—হয়তো সেই দলকেই—সংযত করবে, সপ্রেম করবে। যাদের ধারণা ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে নীতির কোনো স্থান নেই বা প্রয়োজন নেই তারা আজকের দুনিয়াকে কালকের অপঘাতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এমনতর অগ্রগতি কে কামনা করে! অপর পক্ষে আজকের দুনিয়া থেকে কালকের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়াও শ্রেয় নয়। সেদিনকার দুনিয়ায় ধর্ম নিয়ে হিংসা প্রতিহিংসা লেগেই রয়েছিল। রাজ্য নিয়েও। সম্পত্তি নিয়েও।

আমাদের সংস্কৃতিকে ইউরোপায় রেনেসাঁসের বাণী বহুপরিমাণে আধুনিক করেছে, আরো করবে। তেমনি একে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীর বাইরে সার্বজনিক জীবনেও নীতিপরায়ণ করবে ভারতের সত্তার বহুসহস্রাব্দ পূর্বে উপলব্ধ সত্য ও অহিংসা। রামায়ণ ও মহাভারতের নায়করা ছিলেন সত্যসন্ধ। সত্যের জন্যে তাঁদের দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁদের জীবনে সত্যই জয়ী হলো। আর অহিংসাকে সার করে বৌদ্ধ ও জৈন ভাস্কর চিত্রকর শাশ্বত শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। সত্য ও অহিংসা পুরাতন নয়, চিরন্তন। আধুনিকতা মূল্যবান। চিরন্তনতা অমূল্য। আমাদের ভাবী সংস্কৃতি যদি আধুনিকতা ও চিরন্তনতার যুগল অক্ষে আবর্তিত হয় তা হলে তার ভবিষ্যৎ স্বল্পায়ু হবে না, তার থেকে অনর্থ আসবে না, সে হবে আর একটা স্বর্ণযুগের সংস্কৃতি।

সত্য ও অহিংসার সঙ্গে সৌন্দর্যকেও যোগ করি। নয়তো সংস্কৃতি প্রধান অবলম্বন শিল্প না হয়ে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস হবে। আমরা শিল্পীরা সুন্দরের ঘরের লোক। সুন্দরের ঘরাণা। আমরা সৌন্দর্যকেই সংস্কৃতির মধ্যমণি করব।

(১৯৫৭)

হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না

বড়োদার নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে একটা হাসির কথা শুনে এলুম। তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু ফিরে এসে যা দেখছি যা শুনছি তা আমাকে হাসতে দিচ্ছে না। ভাবছি আমরা কোথায় ভেসে চলেছি। ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকব। গৃহবিবাদের প্রথম দিকটা এমনি হাস্যকর হয়ে থাকে।

কথাটা এই। ভাষা কমিশনের রিপোর্টে অধিকাংশের সুরে সুর না মিলিয়ে সুব্বারায়ন ও সুনীতিকুমার উল্টো সুর গেয়েছেন। তাই গোসা করেছেন হিন্দীর এক স্বনামধন্য কবি তথা পার্লামেণ্টের সদস্য। বলেছেন স্বভাষী কোন লেখককে, "দেওঘর থেকে বম্বে, অমৃতসর থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত ভূখণ্ডে দেখি কেমন করে চাকরি পায় সুনীতিবাবুর ও সুব্বারায়নের ছেলেরা ও নাতিরা।"

গল্পটা সুনীতিবাবুর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করার ইচ্ছা ছিল। যোগাযোগ ঘটেনি। জানিনে তিনি হাসতেন না ক্ষেপতেন। হয়তো নাচতেন। আমি কিন্তু ফাঁস করতে যাচ্ছিনে কবিবরের নাম। ভদ্রলোক যা বলেছেন একান্তে বলেছেন, প্রকাশ্যে বলেননি। তবে সত্যি বলেছেন। অপ্রিয় সত্য। ভণ্ডামি না করে অন্তরটা খুলে

দেখিয়েছেন। হনুমানের অন্তরে "রাম" ভিন্ন আর কোন নাম ছিল না। ভক্তদের অন্তরেও "হাম" ভিন্ন আর কোনো সর্বনাম নেই।

বেশ বোঝা যায় হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে। তার পাল্টা হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবার পূর্বদিক থেকে। একমাত্র রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে পূর্বীয়ারা দাঁড় করিয়েছেন চোদ্দটা পনেরটা জাতীয় ভাষা। ইংরেজীও নাকি তাঁদের জাতীয় ভাষা। তাঁদের কথায় ন্যাশনাল ভাষা। নিন্দুকরা বলবে এঁদের অন্তরেও "শ্যাম" ভিন্ন আর কোনো নাম নেই, যদিও এঁদের নামাবলীতে আরো চোদ্দটা নাম আছে। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

হিন্দী কবি বোধ হয় চিন্তা করেননি যে, দেওঘর থেকে বম্বে আর অমৃতসর থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যদি তাঁর গোচারণভূমি হয়, তবে বাদবাকী ভূভাগ হবে অহিন্দী কবিদের মহিষচারণ ভূমি। পরে একদিন গোরু-মোষে গুঁতো গুঁতি করে ক্লান্ত হয়ে শান্তির জন্যে পাঁচিল তুলবে। যেমন করে হলো পাকিস্তান বা অ-হিন্দুস্থান তেমনি করে হবে অহিন্দীস্থান। এক বা একাধিক। ভারতের ইতিহাসে যুগে যুগে দেখা গেছে উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তীদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে বাংলা ও দক্ষিণের রাজন্যরা স্বতন্ত্র হয়েছেন। ঐ করতে করতে ইংরেজকে ঢুকতে ছিদ্র দিয়েছেন। উত্তর ভারতের প্রভু মনোভাব থেকে এসেছে বাংলা ও দক্ষিণের স্বতন্ত্র মনোভাব। ফলে দেশ বিপন্ন ও পরাধীন হয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এ যুগেও ঘটতে পারে। আমাদের নেতারা সারা ভারতের ঐক্য কামনা করেন, তা সত্ত্বেও উত্তর ভারতের প্রভুমনোভাবের যে হাওয়া তাঁরা বুনে যাচ্ছেন, তার থেকে যখন ঘূর্ণিহাওয়া জন্মাবে, তখন তাকে রোধ করবে কে?

উত্তর ভারতের হাতে এমনিতেই ভোট সংখ্যা বেশী। গণতন্ত্রের খেলায় তুরুপের তাস তার হাতে। সারা ভারতের মসনদে সে যাকে

বসাবে, সেই হবে বাদশা, সেই হবে উজীর। মসনদটাও দিল্লীতে। তার মানে উত্তর ভারতে। রাজধানী যেখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধাও সেখানে বা তার চারপাশে। উত্তর ভারতের হাতে এ হলে দুনম্বর তুরুপের তাস? এ ছাড়া আরো একটা তুরুপের তাস দেওয়া হয়েছে তার হাতে। ভারতের শাসনতন্ত্রে বা সংবিধানে লিখেছে হিন্দী হবে ইউনিয়নের সরকারী ভাষা। অর্থাৎ উত্তর ভারতের ভাষা পাবে সর্বাধিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও পেট্রনেজ।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ইংরেজকে হটানোর পর ইংরেজীকে হটানোর ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য থেকে এই ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এতদিনে কারো বুঝতে বাকী নেই যে ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর লড়াইটা দৃশ্যত বিদেশীর সঙ্গে স্বদেশীর লড়াই হলেও কার্যত অহিন্দীর সঙ্গে হিন্দীর লড়াই। ইংরেজী শিক্ষায় কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বের লোক বহুকাল আগে স্টার্ট পেয়ে গেছে, কারণ এই তিনটি স্থানে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতায় এই তিনটি অঞ্চলের লোকের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। এঁটে উঠতে হলে ইংরেজী শিক্ষাটাই তুলে দিতে হয়। তার জায়গায় সূত্রপাত করতে হয় হিন্দী শিক্ষার। তাহলে নতুন করে স্টার্ট পাবে উত্তর ভারতের ইংরেজী শিক্ষায় পেছিয়ে থাকা লোকজন। হিন্দী যেহেতু তাদের মাতৃভাষা সেহেতু কেউ কোনোকালে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না। ইংরেজী শিক্ষার স্টার্ট ইতিমধ্যেই ক্ষয় হয়ে এসেছে। অন্যান্য অঞ্চল ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রগামী হয়েছে। কিন্তু হিন্দী শিক্ষার স্টার্ট কালক্রমে ক্ষয় হবে না, যদি না আমরা সবাই বাংলা একেবারে ছেড়ে দিই, তামিল একেবারে ভুলে যাই, মরাঠীকে একেবারে হিন্দী করে তুলি।

আগেই বলেছি ভারতের মসনদে কে বসবে না বসবে, তা উত্তর ভারতের ইচ্ছানির্ভর। মসনদটা কোথায় হবে সেটাও তার মর্জি। এর

পরে রাজপুরুষ কারা হবে, সেটাও স্থির হয়ে যাবে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তাদের জিততে দিয়ে। যদি জানতুম যে, হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে আমরাও জিততে পারি তাহলে হিন্দীর জন্যে খাটতুম। কিন্তু সে ভরসা আমাদের নেই। সে আশঙ্কাও তাঁদের নেই। কিছুদিন শোনা গেল যে, হিন্দীকে সর্বসাধারণের জন্যে খুব সোজা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ নেই। যে ভাষায় রাজকার্য চলে সে ভাষা কোনো দেশেই খুব সোজা নয়, হতে পারে না। সে ভাষায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে প্রতিযোগীরাই তাকে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলবে। আর পরীক্ষকরাও কঠিনতমকে শিরোপা দেবেন। যেখানে হিন্দীর সঙ্গে অহিন্দীর প্রতিযোগিতা, সেখানে শুদ্ধতম হিন্দীর সূক্ষ্মতম প্রয়োগকেই মূল্য দেওয়া হবে সবচেয়ে বেশী। বিষয়টা ইতিহাস বা দর্শন যাই হোক না কেন।

নিছক ভাষাশিক্ষার বিরুদ্ধে একটিও যুক্তি নেই, কিন্তু ভাষা যেখানে ক্ষমতার বাহন, সেখানে ভাষাশিক্ষার ফলে যদি ক্ষমতালাভ না হয়, তাহলে মানুষ তার বিপক্ষে একশ'টা যুক্তি পেশ করবে। ইংরেজ আমলে হিন্দী ছিল না ক্ষমতার বাহন। তাই কেউ তার বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। যেদিন ইংরেজ চলে গেল, সেদিন ইংরেজীকে সরানোর কথাটাই বড় হয়েছিল, তাই চোখ বুজে ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে বসাতে বাধেনি। ইংরেজী চাইনে এই নেতিবাচক মনোভাবের উপর হিন্দীকে স্থাপন করা হয়েছিল। এখন সেই নেতিবাচক মনোভাব দুর্বল হয়ে এসেছে। ইংরেজীর উপর সে রকম বিরাগ আর নেই। সেইজন্যে হিন্দীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে। আমাদের হিন্দীভাষী ভাইদের এটা বোঝা উচিত যে, শুধু তাঁদের ক্ষমতালাভের জন্যে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে নামিনি, আমাদের

ক্ষমতালাভের কথাটাও আমাদের কল্পনায় ছিল। ইংরেজ এখন তাতে বাদ সাধছে না। সাধছেন তাঁরাই। এটা আর ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া নয়। এটা তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া।

তাঁদের বোঝা উচিত যে, দু-দুখানা তুরুপের তাস তাঁদের হাতে। গণতন্ত্রে অধিকসংখ্যক ভোট্, যা দিয়ে বাদশা-উজীর বানানো যায়, পালটানো যায়। রাজধানী দিল্লী, যেখানকার সবরকম সুযোগ সুবিধা তাঁদের মুঠোর মধ্যে। তার উপর এই ভাষার তাসটিকে তুরুপের তাস করে তাঁরা যে রাজকর্মের খেলায় ক্রমাগত জিতবেন, এটা সহ্য করা ঘোর জাতীয়তাবাদীর পক্ষেও অসম্ভব। অমন করে নেশন তৈরি হয় না। নেশন বলতে বোঝায় জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্ম এই চারটি প্রধান প্রধান বিষয়ে মোটামুটি ঐক্য বা নিদেন-পক্ষে বোঝাপড়া। আমাদের শাসনতন্ত্রে বোঝাপড়ার পরিচয় আর সব বিষয়ে পাচ্ছি। পাচ্ছিনে কেবল ভাষার বেলা এবং ভাষা যেহেতু ক্ষমতার বাহন, সেহেতু সন্দেহ হচ্ছে ক্ষমতাকে গোষ্ঠীগত করার এটা একপ্রকার ছল। এটা অহেতুক সন্দেহ কি না নির্ভর করছে হিন্দী-ভাষীদের মতিগতির উপর।

মতিগতির নমুনা ভাষা কমিশনই দিয়েছেন। অহিন্দীভাষীরা কষ্ট করে হিন্দী শিখবেন, জাতীয় ঐক্যের খাতিরে। কিন্তু সেই জাতীয় ঐক্যের খাতিরে হিন্দীভাষীরা তামিল কিংবা তেলেগু কিংবা ওড়িয়া কিংবা বাংলা শিখবেন না। কষ্ট যদি করতেই হয়, তবে তাঁরা বরং বিদেশী ভাষা শিখবেন। বিদেশী ভাষার প্রতি এই অনুরাগ ও স্বদেশী ভাষার প্রতি এই বিরাগ তাঁরাই আমাদের দেখালেন। এর পরে যদি আমরা ধুয়ো ধরি যে, কষ্ট যদি করতেই হয় তবে হিন্দী কেন, ইংরেজী শিখব, তা হলে সেটা মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আর কী? জাতীয় ঐক্যের ছলনায় আর কেউ কি ভুলবে এর পর?

এখন থেকে অহিন্দীভাষীকে হিন্দী শেখানোর পূর্ব শর্ত হবে হিন্দী-ভাষীকে ভারতের অপর একটি ভাষা শেখানো এবং সে ভাষা হিন্দীর অনুরূপ কঠিন হওয়া চাই এবং প্রতিযোগিতায় তাতেও নম্বর তোলা চাই। আর প্রতিযোগিতার মাধ্যম যদি কোনো এক সার্ভিসে হিন্দী হয়, তবে অপর এক সার্ভিসে তামিল হবে, অন্যতর এক সার্ভিসে বাংলা হবে। আমি জানি এতে কেউ রাজী হবে না। এসব প্রস্তাব নেহাত তর্কের খাতিরে। এ শুধু বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে সমস্যার সমাধান এসব পথে নয়। সমাধানের একটি পথই প্রশস্ত। ভালো করে ইংরেজী শেখা ও বাঙালী, মাদ্রাজী, মরাঠার সঙ্গে টক্কর দেওয়া। এদেও চাইতেও ভালো করে ইংরেজী শেখ, তাহলে এরা যে স্টার্ট পেয়েছে, সেটা ক্ষয়ে আসবে। ইতিমধ্যে এসেছেও অনেকটা। তাছাড়া দিল্লী তো তোমাদের ঘরের কাছে বা ঘরের ভিতরেই। একশ, দেড়শ, টাকার চাকরিগুলোর জন্যে কে আর কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে থেকে দিল্লী যাচ্ছে? সেরকম চাকরিও তো এন্তার সৃষ্টি হয়েছে। সেসব পাচ্ছে কারা?

আমার এই প্রবন্ধে আমি সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলব না। ঝগড়াটা সংস্কৃতি নিয়ে নয়। শাসনতন্ত্র সরকারী ভাষার উল্লেখ করেছে। সংস্কৃতির ভাষার উল্লেখ করেনি। শাসনতন্ত্রের রচয়িতারা হিন্দীকে সরকারী ভাষা করার নির্দেশ দিয়েছেন, সংস্কৃতির ভাষা করতে বলেননি। তাকে জাতীয় ভাষা বলেও আখ্যায়িত করেননি। এমন কি রাষ্ট্রভাষা বলেও ঘোষণা করেননি। সরকারী ভাষা হচ্ছে সরকারের কাজকর্মের ভাষা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা না-ও হতে পারে। সুতরাং হঠাৎ একদল লেখক চোদ্দটা ন্যাশনাল ভাষার রব উঠিয়েছেন কেন বোঝা গেল না। তার সঙ্গে ইংরাজীকেও ন্যাশনাল ভাষা বলে জুড়ে দিতে চাইছেন কেন? এতদিন তো জানা ছিল ইংরেজী হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা।

আমার এই বন্ধুদের কিছু বলতে চাই। অতগুলো ন্যাশনাল ভাষা নিয়ে কোথাও এক নেশন তৈরি হয়নি। সাধারণত দেখা যায় যতগুলো ন্যাশনাল ভাষা ততগুলো নেশন। দুদিন পরে তাঁদের চেয়ে যাঁরা কম বিদ্বান তাঁরা ভাববেনই, বাংলা যখন ন্যাশনাল ভাষা তখন বাঙালীও নেশন। বাঙালীর মনের কোণে যে বাঙালী ন্যাশনালিজম কোনোদিন ছিল না তা নয়। এখনো যে মিলিয়ে গেছে তা নয়। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ন্যাশনালিজম বলতে বিশুদ্ধ ভারতীয় ন্যাশনালিজম কোনোকালে শিকড় গাড়তে পাবে কি না ভাবনা হয়। কখনো দেখি হিন্দু ন্যাশনালিজম ভারতীয় ন্যাশনালিজমের মুখোশ এঁটে ঘুরছে। কখনো দেখি বাঙালী ন্যাশনালিজম ভারতীয় ন্যাশনালিজম সেজেছে। কিছুদিন আগেও মাল্টিন্যাশনাল স্টেটের প্রস্তাব শোনা যেত। যাঁরা সে প্রস্তাব এনেছিলেন তাঁরা একনেশনবাদী নন। এখন তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে বলে শুনিনি। এই যেখানকার পটভূমিকা সেখানে এবারে অঙ্গনে নেমেছেন চোদ্দটা ন্যাশনাল ভাষার ধ্বজা হাতে একদল সৈনিক। এঁরা ইংরেজীকেও তার সঙ্গে জুড়ে ন্যাশনাল বলে টীকা দিয়েছেন। এতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সবল হবে না। সুতরাং যাঁরা হিন্দীর প্রতি বিরূপ অথচ গোঁড়া জাতীয়তাবাদী তাঁরাও প্রতিবাদ করবেন।

শাসনতন্ত্রের রাজ্য বিধানসভাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ এলাকায় বাংলা, ওড়িয়া, তামিল তেলেগু ইত্যাদিকে সরকারী ভাষা করতে পারেন। কেন এতদিন করেননি কেউ বলতে পারেন ? হিন্দীর এখানে হাত নেই। হিন্দীর সঙ্গে একে জড়াতে যাওয়া ভুল। পশ্চিমবঙ্গে যদি বাংলায় সরকারী কাজ চলে হিন্দীওয়ালারা আপত্তি করবেন না। বরং আশীর্বাদ করবেন। কারণ তাঁরাও আমাদের দোহাই দিয়ে অন্যত্র হিন্দী প্রবর্তন করতে বল

পাবেন। সেটা হয়তো আমাদেরই পছন্দ হবে না। বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আমাদেরও কিছু কিছু প্রভাব আছে। সেটা কলমের এক খোঁচায় খোয়াতে আমরা রাজী নই। আমার মনে হয় মাতৃভাষার কথা ভেবে এঁরা নিশান কাঁধে নেননি। নিয়েছেন ইংরেজীর কথা ভেবে।

ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজীর প্রতি আমার মমতা অছে। রামমোহনের কাজ এখনো সারা হয়নি, সুতরাং রামমোহনের যে চিন্তা আমারও সেই চিন্তা। দেশকে আধুনিক করতে হবে, মধ্য যুগের অধিকার থেকে উদ্ধার করতে হবে, শুধু ইংরেজের দখল থেকে উদ্ধার করলেই হবে না। এ কাজ ইংরেজীর সাহায্যেই হতে পারে। সংস্কৃতের সাহায্যে নয়। হিন্দীর সাহায্যে নয়। এমনকি বাংলার সাহায্যেও নয়। ইংরেজীর স্থান নেবার মতো যোগ্যতা এখনো বাংলারও হয়নি। বাংলায় ডক্টরেট? এ কি ছেলেখেলা? এম-এ, এম-এসসি বাংলায়? এম-বি, বি-ই বাংলায়? ধীরে, বন্ধু, ধীরে। আন্তর্জাতিক শিক্ষামান অবনত করা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ইংরেজীকে এখনো অনেক দিন রাখতে হবে সে ন্যাশনাল ভাষা বলে নয়। উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন বলে। উচ্চতর পরীক্ষার মাননির্দেশক বলে। প্রতিযোগিতায় সুবিচারের একমাত্র ন্যায়দণ্ড বলে।

যা বলছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংরেজীকে আরো অনেকদিন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন হিসাবে রাখতে চাই। প্রতিযোগিতা ও উচ্চশিক্ষা এক অপরের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তা বলে আমি এমন কথা বলব না যে, ইংরেজী ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা ও সে হিসাবে চিরস্থায়ী হওয়ার হক্দার। ভারতের হিন্দী-অহিন্দী কোনো খণ্ডের জনমত এতদূর যেতে রাজী হবে না। আর জনমতকে ডিঙিয়ে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কোনো একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে আখ্যায়িত করা যায় না বা চিরকাল চলিত রাখা যায় না।

তা ছাড়া আরো একটি কথা। আজ না হয় ইংরেজ আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। কাল যদি বৈরীভাবাপন্ন হয়, তখন কি দেশের লোক ইংরেজীর মর্যাদা মানবে? ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যদি কোনোদিন সংঘাত বাধে, তাহলে ইংরেজীই হবে তার প্রথম ক্যাজুয়ালটি। তখন শুধু হিন্দীওয়ালারা নয়, অহিন্দীওয়ালারও ইংরেজীকে "কুইট ইণ্ডিয়া" করাবে। রক্ত গরম হলে কেউ ঠাণ্ডা যুক্তি শোনে না। আমি যে কারো কান পাব সে আশা রাখিনে।

সুতরাং সবরকম অবস্থার কথা ভেবে ইংরেজীর পক্ষের উক্তিকে সংযত করতে হয়। কোনোদিনই সে বাংলা হিন্দী ইত্যাদির সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তার কেসটা নিতান্তই একটা স্পেশ্যাল কেস। সে যদি থাকে তবে চিরকালের জন্যে নয় কিংবা সব কাজের জন্যে নয়। সেইজন্যে বাংলা হিন্দী ইত্যাদির সঙ্গে তাকে একসূত্রে গাঁথা ভুল। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তার থাকার মেয়াদ আর আট বছর মাত্র নয়। শাসনতন্ত্র সংশোধন করতেই হবে। কিন্তু সংশোধিত শাসনতন্ত্রে তাকে সনাতন করার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটা স্বাধীন দেশ একটা বিদেশী ভাষাকে তার শাসনতন্ত্রে খুঁটি গাড়তে বা এন্‌ট্রেঞ্চড হতে দেবে এটা অভাবনীয়।

কেউ কেউ তর্ক করছেন এই বলে যে, উর্দুও তো একটা বিদেশী ভাষা। সেটা কুতর্ক। উর্দুতে বিদেশী শব্দ প্রচুর আছে, ওর লিপিটা পরদেশী, কিন্তু ওটা ভারত ও পাকিস্তান ভিন্ন আর কোথাও জন্মায়নি, বাড়েনি, চলে না, চলবে না। আবার এমন তর্কও উঠেছে যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যেহেতু ভারতীয় আর ইংরেজী যেহেতু তাদের ভাষা ইংরেজীও ভারতীয় ভাষা। ইংলণ্ডের জিপসিয়া যেহেতু ইংরেজ আর রোমানি যেহেতু তাদের ভাষা সেহেতু রোমানিও ইংলণ্ডের অন্যতম দেশ-ভাষা! পোল্যাণ্ডের ইহুদীরা যেহেতু পোল আর য়িডিশ যেহেতু

তাদের ভাষা সেহেতু য়িডিশও পোল্যাণ্ডের অন্যতম দেশভাষা। মরি মরি! কী বুদ্ধি! ইংরেজীর উকিলরা তার কেসটাকে অতিবুদ্ধির দ্বারা মাটি করবেন।

ইংরেজীর ভাগ্যের সঙ্গে না জড়িয়ে বাংলা ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার কথা যদি আলাদা করে ভাবি, তাহলে দেখতে পাব কেবল রাজ্য সরকারের উপর নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপরও তাদের দাবী আছে। এ কখনো হতে পারে না যে, ভারতের সন্তান আমি ভারতের পার্লামেণ্টে আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে পাব না। তুমি যদি বাংলা বুঝতে না পার অনুবাদকের সাহায্য নাও। তবে এ কথাও ঠিক যে, আমিও আমার অধিকার সব সময় খাটাতে যাব না। তোমাকে শোনানোই যখন আমার উদ্দেশ্য, তখন মাঝখানে অনুবাদক রেখে আমি ভুল বোঝার অবকাশ রাখি কেন? আর দু'জনেরই তো সময়ের দাম আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বাংলা ভাষায় দরখাস্ত পাঠানোর মৌলিক অধিকারও আমার রয়েছে। এটাও আমি দাবী করতে পারি যে, আমাকে যখন ট্যাক্সের জন্যে নোটিশ দেওয়া হবে, তখন সে নোটিশের একপ্রস্থ বাংলা নকলও যেন দেওয়া হয়। এমনি একশ' রকম ব্যাপারে আমি বাংলার জন্যে ঠাঁই করে নিতে পারি। আড়াই কোটি লোক একজোট হয়ে আন্দোলন করলে কেউ এসব দাবী ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমি বাংলার উদাহরণ দিলুম। বাংলা, ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল সব ভাষার বেলা এটা খাটে। কেন্দ্রীয় সরকারকে একদিন না একদিন এসব ভাষার সঙ্গে রফা করতে হবেই। তবে এসব দাবী যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। যে ডালে বসে আছে সেই ডালকে না কাটে। জাতিকে দুর্বল করে বিশৃঙ্খল করে আখেরে কোনো লাভ নেই। কাজেই যখন যা দাবী করব তা না করলে নয় বলেই করব।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করলেই নয়। সংশোধনের সময়

'আঞ্চলিক'কে কেটে 'ভারতীয়' করতে হবে। 'আঞ্চলিক' সত্যি আপত্তিকর। অপর পক্ষে 'জাতীয়' বা 'ন্যাশনাল বিপত্তিকর। এক দেশে একাধিক নেশন থাকে না, থাকতে পারে না। তাই একাধিক 'ন্যাশনাল' ভাষা বিবেচনার অযোগ্য। 'ভারতীয়' বলতে তেমন কোনো বাধা নেই। তারপর হিন্দী প্রবর্তনের জন্যে যে পনেরো বছর মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়েছে সেটাকে পঁচিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর করা নিষ্ফল। অহিন্দী ভাষীর উপর কোনো দিনই গায়ের জোরে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তা হলে গায়ের জোরে মেয়াদ বেঁধে দেওয়া কেন? অনুশাসনমাত্রেরই উদ্দেশ্য অনিচ্ছুককে বাধ্য করা। যেখানে বাধ্য করা ভালো সেখানে অনুশাসন ভালো। যেখানে বাধ্য করা খারাপ সেখানে অনুশাসন খারাপ। আমাদের শাসনতন্ত্রে খারাপ কিছু থাকবে কেন? কাজেই হিন্দী প্রবর্তনের জন্যে কোনো অনুশাসন রাখা উচিত নয়। শুধু এইটুকু বললে চলবে যে ভারতের শাসনকার্য ভারতীয় ভাষাগুলির সাহায্যে চলবে, যেসব ক্ষেত্রে হিন্দী নির্বিবাদে ব্যবহার করা যেতে পারে সেসব ক্ষেত্রে হিন্দী ব্যবহার করা হবে, যে সব ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা নির্বিবাদে ব্যবহার করা যেতে পারে সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে, যেখানে নির্বিবাদ ব্যবহার সম্ভব নয় সেখানে বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকবে। ইংরেজীর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজীও পড়ে, আদালত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষাও পড়ে।

আসল কথা বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে। এ দায়িত্ব হিন্দী অহিন্দী সব ভাষাভাষীর। এখন পর্যন্ত এক সার্বভৌম ভাষার একমাত্র উত্তরাধিকারী রূপে অপর সার্বভৌম ভাষা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কল্পনাই করা হয়েছে। স্বাধীন প্রজার উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে যাওয়াটাই অন্যায়। আর হিন্দী ইংরেজীর সার্বভৌম উত্তরাধিকারী হবে

এটার মধ্যেও একটা আইনের ফাঁকি আছে। বড় ছেলে বাপের সমস্ত সম্পত্তি পায় না। মেজ সেজ ছোটরা কেউ ভেসে আসেনি। কেনই বা তারা যে যার উত্তরাধিকার ছেড়ে দিয়ে বড় ছেলের অনুগ্রহনির্ভর হয়ে থাকবে? ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে কোনো একটি ভাষার সার্বভৌম দাবী খাটবে না। হিন্দী বড় জোর অগ্রাধিকার চাইতে পারে। ইংরেজীর স্থলে হিন্দী সর্ব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। এ দেশে কেবল ন্যাশনালিজম বলে একটিমাত্র শক্তি কাজ করছে এমন নয়। আমরা যাকে ন্যাশনালিজম বলতে ভয় পাচ্ছি অথচ যাকে আঞ্চলিকতা বললে খাটো করা হয় সেটাও একটা শক্তি। ইউরোপ হলে কেরল, তামিলনাড, অন্ধ্র প্রদেশ, উৎকল, পশ্চিমবঙ্গ এক একটি নেশন বলে গণ্য হতো। এখানে নেশন বলে কেউ দাবী করছে না যে এটা আমাদের সৌজন্য ও ত্যাগ। দোহাই তোমাদের, এর চেয়ে বড় ত্যাগ প্রত্যাশা কোরো না। শাসনতন্ত্রে এরকম একটা অলিখিত প্রত্যাশা রয়েছে। অথচ হিন্দীর কাছে বা হিন্দীভাষীদের কাছে অনুরূপ কোনো প্রত্যাশা নেই। সব দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি যদি হয় ত্যাগের সাম্য তো হিন্দী বা হিন্দীভাষী প্রজাগণকে কেন সার্বভৌম উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে? ওরাই যেন নেশন। আমরা যেন ন্যাশনাল মাইনরিটি।

শাসনতন্ত্রের ভাষাঘটিত পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। টুকরো-টাকরা পরিবর্তন কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের সংশোধিত শাসনতন্ত্র হবে দুটি সমান শক্তির স্বীকৃতি ও সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি তো ন্যাশনালিজম, অন্যটি ঠিক তা নয়, অথচ আঞ্চলিকতার চেয়ে বলবান ও বড়। ইতিহাস আমাদের নেতাদের চ্যালেঞ্জ করছে। দেখতে চায় তাঁরা কত বিজ্ঞ। তাঁরা কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন না?

(১৯৫৭)

ইংরেজী কেন কোথায় কতদূর

আমরা কোন্ দেশের মানুষ? ভারতের। কোন্ যুগের মানুষ? বিংশ শতাব্দীর। দেশ আর যুগ দুই আমাদের কাছে সত্য। পাখীর কাছে যেমন নীড় আর আকাশ। এর একটাকে একান্ত করে যারা দেখে তারা দেশপ্রেমিক হতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ নয়। তারা ও আমরা—দুই স্বতন্ত্র যুগের সন্তান। অথবা তারা যুগধর্মী হতে পারে, কিন্তু তারা ভারতের ঘরের ছেলে নয়। তারা ও আমরা পরের ছেলে ও ঘরের ছেলে।

দেশ ও যুগ দুই আমাদের কাছে সত্য। দেশ বলতে বোঝায় দেশের জন, দেশের মন। দেশের দশ জনের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই, দেশের মন জানতে চাই, সেইজন্যে শিখি দেশভাষা—বাংলা, হিন্দী, তামিল, মারাঠী ইত্যাদি। তেমনি যুগ বলতে বোঝায় যুগের জ্ঞান, যুগের ধ্যান, যুগের কর্ম, যুগের ধর্ম। যুগের সঙ্গে তাল রাখতে চাই, পা ফেলতে চাই, সেইজন্যে শিখি এ যুগের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা—ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে একপ্রস্থ ভাষা, যুগের সঙ্গে অভিন্ন হবার জন্যে আরেক প্রস্থ ভাষা।

কিন্তু মানুষের আয়ু পরিমিত। ভাষাশিক্ষাও সহজ নয়। সেইজন্যে দুই প্রস্থ ভাষাকে কমিয়ে এনে দুটিতে দাঁড় করাতে হয়। ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি হিন্দী বেশী দূর পড়িনি, ফরাসী আরম্ভ করে ছেড়ে দিয়েছি। ওড়িশায় জন্ম, তাই ওড়িয়া জানি। আর জানি কিছু সংস্কৃত। কিন্তু হাতে অন্য কাজ না থাকলে আমি হিন্দী ও ফরাসী ভালো করে শিখতুম। দেশের মন যুগের ধ্যান তা হলে আমার কাছে আরো

পরিষ্কার হতো। বিজ্ঞানের দিকে যাঁদের ঝোঁক জার্মান বা রাশিয়ান তাঁদের শিখতেই হবে। তেমনি দক্ষিণ ভারতকে চিনতে হলে তামিল তেলেগু অপরিহার্য। আর দক্ষিণ ভারতকে না চিনলে ভারতকেও সম্যক চেনা যায় না, যেমন বিজ্ঞান না জানলে বিংশ শতাব্দীকেও ঠিকমতো বোঝা যায় না।

অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীকে সময়ের অভাবে ও কাজকর্মের চাপে দুটিমাত্র ভাষাকেই অবশ্য শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করতে হবে। একটি তো মাতৃভাষা। অপরটি ইংরেজী। দুটির কমে কিছুতেই চলবে না। নয়তো শিক্ষিত মহলে সমানভাবে চলাফেরা করা অসম্ভব হবে। শিক্ষিত ভারতীয়মাত্রেই দ্বিভাষী। স্বভাষী তথা ইংরেজীভাষী। যাঁরা ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীর বিধান দিচ্ছেন তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন যে শিক্ষিত ভারতীয়মাত্রেই দ্বিভাষী। কিন্তু তাঁরা বুঝেও বুঝছেন না যে ইংরেজী আমরা এত কষ্ট করে শিখি যুগের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যেই। যুগসাগরে সাঁতার কাটার জন্যেই। ইংরেজীর অভাব হিন্দীকে দিয়ে পূরণ হতে পারে না। হিন্দী ও ইংরেজী এক পর্যায়ের ভাষা নয়। হিন্দী আমাদের অন্যতম দেশভাষা। আর ইংরেজী আমাদের অগ্রগণ্য যুগভাষা। হিন্দীকে যুগভাষা পর্যায়ের ভাষা বলবে না কেউ। এ যুগের অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে ওর যা কারবার তা উৎপাদকের নয়, আমদানিকারকের। ইংরেজী থেকে তর্জমা না করলে আধুনিক বলতে ওর তেমন কিছু নেই। আমরা সোজা ইংরেজীর কারখানায় না গিয়ে হিন্দীর আড়তে যাব কেন? এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা না পড়ে হিন্দী বিশ্বকোষ পড়তে চাইব কেন? তার চেয়ে বাংলা বিশ্বকোষ পড়লে সময় আরো বাঁচে। সময় মানে আয়ু। আয়ুর অপচয় করতে নেই।

যুগের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে, পা ফেলতে হলে, রেস দিতে হলে,

ইংরেজী শিখতে হবেই। হিন্দী এর বিকল্প নয়। বাংলাও নয়। সুতরাং যারা ইংরেজী শিখবে না তারা অর্ধশিক্ষিত বলেই গণ্য হবে। হোক না কেন বাংলায় পণ্ডিত, অধিকন্তু হিন্দীতে বিদগ্ধ। সে যুগ আর নেই যে যুগে ইংরেজী না জানলেও শিক্ষিত মহলে মান পাওয়া যেত। সে যুগ আর ফিরবেও না কোনো দিন। অপর পক্ষে যারা শুধু ইংরেজীটাই মন দিয়ে শেখে, মাতৃভাষার ধনদৌলতের খোঁজ রাখে না, তারাও অর্ধশিক্ষিত। ইংরেজ আমলে তারা সাহেবের সঙ্গে সাহেব হয়ে মান পেয়েছে বলে এখনো পাবে? তা হবার নয়। তাদেরও শিক্ষা বাকী আছে। দেশের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যুগের সঙ্গে অভিন্ন হতে যাওয়া বৃথা। জনগণের মন পেতে হবে। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারা পেছিয়ে থাকবে আর আমি একা এগিয়ে যাব এর নাম প্রগতি নয়। আমার কাছে আধুনিকতা ও সার্বজনিকতা এক ও অবিভাজ্য। দেশকে আধুনিক করতে হবে, আধুনিককে দেশীয় করতে হবে। মাতৃভাষা ও ইংরেজীভাষা দুই আমাদের কাছে হবে মূল্যবান।

তবে সমান মূল্যবান নয়। কারণ ইংরেজী থেকে অনেক কিছুই আমরা বাংলায় চালান দিতে পারি। জাপানীদের মতো উঠে পড়ে লাগলে প্রত্যেকটি ইংরেজী বই, ভালো বই, সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করা যায়। জাপানীরা সাধারণত ভাবানুবাদ করে। আমাদের পক্ষে সেটা আরো সহজ। সামনের পঞ্চাশ বছর যদি জোর কদমে অনুবাদ-কার্য চলে তা হলে ইংরেজী না শিখেও শিক্ষিত মহলে সমানভাবে মেলামেশা চলবে। তার আগে নয়। তখনো ইংরেজী জানার প্রয়োজন থাকবে, কারণ কোনো অনুবাদই মূলের মতো হতে পারে না। বিশেষত ভাবানুবাদ অনেক সময় ভুল ধারণার জন্ম দেয়। আমার কবিতার জাপানী অনুবাদ ছাপা হবার পর একজনকে বললুম ওটা

আবার ইংরেজী করে আমাকে শোনাতে। যা শুনলুম তা আমার লেখাই নয়।

অতএব পঞ্চাশ বছরের তুমুল অনুবাদচর্চার পরেও ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে, যদি মূল রচনার কোনো মূল্য থাকে। থাকবেই মূল্য, কারণ রচনা হচ্ছে রিয়ালিটির প্রত্যক্ষ দর্শন। রিয়ালিটির যদি মূল্য থাকে তবে মূল রচনারও মূল্য আছে। ইংরেজকেও এই কারণে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা পড়তে হবে বাংলায়। বৈষ্ণব কবিতা পড়তে হবে বাংলায়। অনুবাদে মূলের স্বাদ মিলবে না। বাংলা যদি আরো উন্নত হয় মূলের গুণেই হবে, মৌলিক রচনার গুণেই। আমরা যারা বাংলায় লিখি এ সত্য সব সময় মনে রাখব। রিয়ালিটিকে বাংলায় সরাসরি রূপান্তরিত করতে হবে, ইংরেজীর মাধ্যমে নয়। এ হলো লেখক মহলের কর্তব্য। আর শিক্ষিত মহলের কর্তব্য রিয়ালিটিকে বাংলার মাধ্যমে না পেলে ইংরেজীর মাধ্যমে পাওয়া। মিথ্যা জাতীয়তার দোহাই দিয়ে আনরিয়াল জগতে বাস করা বিড়ম্বনা। রিয়াল জগতে বাস করলে জাপানীরা কখনো যুদ্ধে নেমে মার খেয়ে ঘায়েল হতো না। এখন তাদের মধ্যে ইংরেজী শেখার জোয়ার এসেছে। দুটি বিদেশী ভাষা প্রত্যেককে অবশ্য শিখতে হয়। তার একটি ইংরেজী, অন্যটি ফরাসী কিংবা জার্মান। রিয়াল জগতে বাস করব, না আনরিয়াল জগতে বাস করব, এ হলো জীবনমরণের প্রশ্ন। এখনো এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি বলেই ইংরেজীর বিরুদ্ধে এত কথা শোনা যায়।

এতক্ষণ যা লিখলুম তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির এলাকায় পড়ে। সরকার বা শাসনের এলাকায় নয়। সে এলাকায় ইংরেজী রাখার কিছুমাত্র দরকার থাকত না, যদি বাংলাদেশ আলাদা একটা রাষ্ট্র হতো। অথবা ভারত সরকারের ভাষা যদি বাংলা হতো তা হলেও ইংরেজীর দরকার

হতো না। তার ভাষা বাংলা নয় বলেই আমাদের এত মাথাব্যথা। আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি কেন্দ্র থেকে ইংরেজী উঠে গেলে ও তার শূন্য স্থানের খানিকটা বাংলাকে না দিলে কেন্দ্রীয় শাসনের উপর আমাদের বিশেষ কোনো হাত থাকবে না, কণ্ঠস্বর সেখানে পৌঁছবে না। পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় এমনিতেই আমরা হটতে লেগেছি, এর পরে তলার দিকে থাকব। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট থেকে বাঙালীর নাম মুছে গেছে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডেও বাঙালী নেই। সার্ভিসগুলোর থেকে ক্রমেই আমরা সরে যাব। এই কি সেই ত্যাগের সাম্য যার উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা? না জাতীয় ঐক্য বলতে এই বোঝায় যে এক ভাই হবে দৈত্য, আর সকলে হবে বামন?

নর্মান আমলের পর আট শ' বছর কেটে গেছে। এখনো ইংলণ্ডের রাজপরিবারে, অভিজাত সমাজে, হোটেলে রেস্টোরাণ্টে ফরাসী ভাষার আদর। তা হলে আমাদের এদেশেই বা কেন পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় ইংরেজী ভাষার কদর থাকবে না আরো অনেক কাল?

জাতীয় আত্মসম্মান যদি আহত হতো ইংরেজরা তাদের দেশের হোটেলের মেনু ফরাসীতে ছাপতে দিত না, হোটেল বয়কট করত। জীবনে এমন দুটো একটা ক্ষেত্র থাকবেই যেখানে জাতীয় আত্মসম্মানই একমাত্র গণনা নয়। সে ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের লোক ফরাসী পছন্দ করবে, ভারতের লোক ইংরেজী পছন্দ করবে। এই তো সেদিন ইন্দোনেশিয়ার লোক রোমক লিপিকে করল নিজেদের ভাষার লিপি। চীনারাও শুনছি তাই করবে, বিকল্পে। জাতীয়তা কি তবে উৎকট বর্জননীতি চালাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কেবল আমাদেরই দেশে?

সরকারের কাজকর্মের ভাষা যাই হোক না কেন কর্মচারী নির্বাচনের জন্যে যেসব প্রতিযোগিতা হয় সেগুলি ইংরেজীতে হলে যেমন সুবিচার হতে পারে হিন্দীতে বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হলে তেমন সুবিচার

সম্ভব নয়। কারণ যাদের মাতৃভাষা হয় প্রতিযোগিতার বাহন তারা জন্মস্বত্বে একটা অলক্ষ্য সুবিধা পায়, সেটা তাদের অন্যভাষী প্রতিযোগীরা পায় না, সুতরাং নিছক গুণের বিচারে যার যা পাওনা তার থেকে সে বঞ্চিত হয়। ইংরেজীতে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে ভারতীয়রাও কোনো কোনো স্থলে সফল হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়ে তবেই ভারতীয়রা নিষ্কণ্টক হলো। তেমনি হিন্দী বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রতিযোগিতা হলে সব প্রতিযোগী যদি স্বভাষী না হয় তবে নিষ্কণ্টক হবার জন্যে একদিন না একদিন পরভাষীকে তাড়াবার জন্যে লোকে দেশ ভাগ করার কথাই ভাববে। প্রতিযোগিতা যেখানে স্বভাষীর সঙ্গে স্বভাষীর সেখানে না হয় ইংরেজীকে বাদ দাও। কিন্তু যেখানে হিন্দীভাষীর সঙ্গে অহিন্দী ভাষীর সেখানে ইংরেজীর বদলে হিন্দীকে প্রতিযোগিতার বাহন করলে দেশবিভাগ একদিন অনিবার্য হবে। রফা হিসাবে একদলের জন্যে হিন্দীতে ও আরেকদলের জন্যে ইংরেজীতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে তো দেশবিভাগের বিষবৃক্ষ জেনেশুনে রোপণ করা হবে। প্রত্যেকটি সার্ভিস ধীরে ধীরে দু'ভাগ হয়ে যাবে। একদিন একদল যাবে হিন্দীস্থানে, আরেকদল যাবে অহিন্দীস্থানে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগিতাগুলিতে নেপালী প্রতিযোগী থাকতে বাংলাকে বাহন করাও অদূরদর্শিতা হবে। তেমনি আসামের প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙালী প্রতিযোগী থাকতে অসমিয়াকে বাহন করাও হবে অদূরদর্শিতা। সব রাজ্যেই কিছু কিছু অন্যভাষী থাকবেই। সেইজন্যে একটিমাত্র ভাষায় প্রতিযোগিতা করতে হলে ইংরেজীই সে ভাষা। একাধিক ভাষায় করতে গেলে রাজ্যভাগের কল্পনা মনে জাগতে পারে।

ইংরেজী থেকেই আমাদের ঐক্য এসেছে, যদিও ইংরেজ থেকে

এসেছে পরাধীনতা। এই জটিল সত্যটিকে সরল করে আনলে ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে। ইংরেজকে বিদায় দিয়ে স্বাধীন হয়েছি, তার থেকে এটা আসে না যে ইংরেজীকে বিদায় দিলেও আমরা একত্র থাকব। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে এক একটি ভাষাকে অবলম্বন করে এক একটি নেশন গড়ে ওঠে। সুইজারল্যাণ্ডের মতো দুটি একটি ব্যতিক্রমকে বলা যেতে পারে নিয়মের নিপাতন। নিপাতনই নিয়মের প্রমাণ। ভাষাগুলি সুইসদের নিজস্ব নয় বলেই ওরা তা দিয়ে দেশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ওটা যেন তিন ভাষার তেমাথা। ভারতবর্ষের ছবিখানা সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানে যার যার ভাষা তার তার নিজস্ব। অর্থাৎ এ যেন ফরাসী জার্মান ইটালিয়ানের একান্নবর্তী পরিবার। এ পরিবার ভেঙে যেতে পারে, ভাই ভাই পৃথক হতে পারে, সহযোগিতার বদলে প্রতিযোগিতার ভাব বাড়লেই। এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পক্ষপাতের ভাব জাগলেই।

স্বৈরতন্ত্রী সরকারের চেয়ে গণতন্ত্রী সরকারের কর্মচারীসংখ্যা বেশী। গণতন্ত্রী সরকারের চেয়ে সমাজতন্ত্রী সরকারের কর্মচারীসংখ্যা বহুগুণ। সুতরাং কর্মচারী নির্বাচনের প্রতিযোগিতা দিন দিন আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। হিন্দীকে একমাত্র মাধ্যম করলে অবিচার এড়ানো যাবে না। হিন্দী ইংরেজী উভয়কে মাধ্যম করলে প্রত্যেকটি সার্ভিস দু'ভাগ হয়ে যাবে মনে মনে। ধীরে ধীরে সৈন্যদলের মধ্যেও ভেদবুদ্ধি ঢুকবে। তা হলে দেশরক্ষা করবে কে?

সরকারী ভাষা কমিশন গোড়ায় ভুল করেছেন। ইংরেজ যেমন এদেশকে পরাধীন করেছিল তেমনি ইংরেজী থেকে এসেছিল ঐক্য। পরাধীনতার অন্তরায়কে সরিয়ে স্বাধীন হওয়া ভালো। কিন্তু ঐক্যের অবলম্বনকে হটিয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়া ভালো নয়। ছত্রভঙ্গতার প্রশ্রয় না দিয়ে হিন্দী প্রবর্তন যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে হোক। কিন্তু

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেখানে ইংরেজীকেই একমাত্র মাধ্যম রাখতে হবে আরো অনেক কাল। কেন্দ্রীয় সরকারের তো নিশ্চয়ই, রাজ্য সরকারেরও যথাসাধ্য। নয়তো একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি হবে, যেমন ইংরেজ শাসনের আগে ছিল। ঐক্যের বনেদ পাকা না করে এসব খামখেয়ালি নিতান্ত কাঁচা কাজ। বাবুরা ধরে নিয়েছেন যে ভারতের ঐক্য ভারতীয়দেরই হাতে গড়া এবং অটুট। তা নয়। আর হিন্দী সেটাকে মজবুৎ করা দূরে থাক আর একটু ঝাঁকিয়ে দেবে। যদি তাঁদের সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়। নয়তো হিন্দীর প্রতি আমার কোনো বিরূপভাব নেই।

যেমন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমনি উচ্চতর পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সুবিচার চাই, ঐক্য চাই, সুতরাং ইংরেজী চাই। তা ভিন্ন শিক্ষার মান উন্নত রাখার উপায়ও নেই।

(১৯৫৭)

ইংরেজীর স্থান

(শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র)

ইংরেজের শাসন শেষ হবার পর ইংরেজীর প্রয়োজন শেষ হবে না কেন, এর উত্তরে দুটিমাত্র জোরালো যুক্তি আছে। তার একটি হচ্ছে: ইংরেজের উত্তরাধিকারী যদি সব ভারতীয় হয়ে থাকে তবে ইংরেজীর উত্তরাধিকারী সব ভারতীয় ভাষা। একা হিন্দী নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে সব ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করতে হবে। কেবল হিন্দী নয়। তা যতদিন সম্ভব না হয়েছে ততদিন সকলের প্রতি সুবিচারের অনুরোধে ইংরেজীকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের

ভাষাহিসাবে রাখতে হবে। "ততদিন" মানে "চিরদিন" নয়। কিন্তু কতদিন তাও বলা কারো সাধ্য নয়। এর জন্যে সবাইকে ডেকে আপোসের চেষ্টা করা যেতে পারে। অধিকাংশের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার নাম আপোস নয়।

দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে: দেশ তিন শ' বছর পেছিয়ে ছিল বলেই পরাধীন হলো। পরাধীনতা ঘুচেছে, কিন্তু পেছিয়ে থাকাটা পুরোপুরি ঘোচেনি। ইংলণ্ড আমেরিকা জার্মানী রাশিয়া ফ্রান্স যে পরিমাণে আধুনিক, ভারত সে পরিমাণে আধুনিক এখনো হয়নি। হতে আরো অনেক দিন লাগবে। সেই দিনটিকে এগিয়ে আনতে হলে যা-যা করতে হবে তার একটি হচ্ছে ইংরেজী নামক একটি অগ্রগামী ভাষার ঘোড়ায় চড়ে বিশ্বের আধুনিকতম চিন্তার সঙ্গে বাজি রেখে দৌড়ানো। ঘোড়াবদলের সময় এখনো আসেনি। মধ্যস্রোতে ঘোড়াবদল করা মূর্খতা। ইংরেজীর চাপে ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ হয়নি বলে যে নালিশ উঠেছে সেটা নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ। সে নালিশ অন্যের মুখে সাজতে পারে, বাঙালীর মুখে সাজে না। ইংরেজীর চাপে অবিকাশ নয়, ইংরেজীর সঙ্গে গভীরতর পরিচয়ের ফলেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ অন্যের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। এই পরিচয় ক্ষীণ হলে বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব ফুরিয়ে আসবে। সংখ্যাবৃদ্ধি বা কলেবরবৃদ্ধি তো শ্রীবৃদ্ধি নয়। সেদিক থেকে ভাবনার কারণ না থাকতে পারে, ঐশ্বর্যের দিক থেকে আছে। সুতরাং আর যারা যে সিদ্ধান্তই নিক আমরা কখনো এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেব না যার ফলে আমাদের সাহিত্যের নেতৃত্বহানি ঘটবে। মধ্যস্রোতে ঘোড়াবদল আমাদের জন্যে নয়। সরকারী ভাষা যাই হোক না কেন আধুনিকতার ভাষা ইংরেজীই থাকবে, এবং সে ভাষায় আমাদের অরুচি ধরবে না। তার সঙ্গে গভীরতম পরিচয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, যদি বাংলা

সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের তেমন উচ্চাভিলাষ ও জল্পনা কল্পনা থাকে।

না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে আপোসের অবকাশ নেই।

শান্তিনিকেতন, ১২ই জানুয়ারী ১৯৫৮

লেখক সম্মেলনের কথা

এই ক'মাসের মধ্যে আমাকে তিন তিনটি লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে হয়েছে। একটি জাপানে। একটি বড়োদায়। একটি কলকাতায়। এর উপরে আরো একটির নিমন্ত্রণ ছিল। আহ্‌মদাবাদে। গ্রহণ করতে পারিনি।

লেখকেরা যদি সম্মেলনে যোগ দিয়ে বেড়ায় তা হলে লেখায় অভিনিবেশ থাকে না। আর তাদের যদি সম্মেলনে কিছু বলতে হয় ও বোকার মতো তারা যদি তাই নিয়ে দিনরাত ভাবে তা হলে তাদের হাতের কাজ হাতেই রয়ে যায়, পাঠকের পাতে পৌঁছয় না। অমন করে পাঠককে বসিয়ে রাখা ভালো নয়। পাঠকই যখন লেখকের মালিক। মনে করুন আমার বাড়ীর চাকর পরের ফাইফরমাশ খাটতে গিয়ে আমার জন্যে বাজার করে আনতে দেরি করছে। তা হলে আমার চাকরি ছেড়ে পরের চাকরিই করুক সে।

তেমনি লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা অলিখিত চুক্তি আছে। একজন লিখবে, একজন পড়বে। পড়ার লোক যদি হাঁ করে বসে থাকে আর লেখার লোক যদি পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি পূজা করে বেড়ায় তা হলে ভিতরে ভিতরে চুক্তির খেলাপ হয়। ক্রমে চুক্তিভঙ্গ থেকে আসে মনোভঙ্গ। এ ছাড়া রসভঙ্গ তো আছেই।

উপন্যাসের মাঝখানে হঠাৎ ছেদ টানলে রস জমতে জমতে ফিকে হয়ে যায়।

এইসব কারণে লেখক সম্মেলনের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে। না ভেবে না চিন্তে ঝড়ের মতো গিয়ে ঝড়ের মতো বাগ্‌বিস্তার করে ঝড়ের মতো ফিরে আসার কৌশল যদি জানতুম তা হলে হয়তো আমার হাতের কাজের ক্ষতি অত বেশী হতো না। কিন্তু তা হলে আবার সম্মেলনের শ্রোতাদের প্রতি অবিচার করা হতো। তাঁরাও তো তাঁদের হাতের কাজ ফেলে কত দূর থেকে শুনতে এসেছেন লেখকদের কথা। কেনই বা তাঁরা সুচিন্তিত উক্তি থেকে বঞ্চিত হবেন? কেন শুনতে বাধ্য হবেন কবেকার চিন্তার চর্বিতচর্বণ? তাঁদের সঙ্গেও একটা অলিখিত চুক্তি আছে। চুক্তিভঙ্গ থেকে আসে মনোভঙ্গ তাঁদের বেলাতেও। নিজেকে অমন করে উভয়সঙ্কটে ফেলা আমার পক্ষে সুখের নয়। সুতরাং নেহাত নাচার না হলে আমি নিমন্ত্রণরক্ষার অঙ্গীকার দিইনে।

যা হোক এই ক'মাসে তিন তিনটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমার কিছু শিক্ষা হয়েছে। সেটা অন্যের হয়তো হয়নি। সেইজন্যে অন্যের গোচর করতে বসেছি। এর ফলে হয়তো সময়ের ও শক্তির অপচয় কমবে। অর্থের অপচয়ও। যা বাঁচবে তা দিয়ে আরো কত কাজ হবে। আরো কত বড় কাজ।

লেখক সম্মেলন, প্রথমত লেখকদের মেলামেশার জন্যে। দুনিয়ায় আর সকলের মেলামেশার উপলক্ষ আছে, লেখকদের নেই, সেইজন্যেই মাঝে মাঝে সম্মেলনের প্রয়োজন। এক জায়গায় অনেককে আমরা পাই। অনেকের সঙ্গে সভার বাইরে আলাপ আলোচনা করি, ভাববিনিময় করি। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ারও পরোক্ষ মূল্য আছে। তা যদি না হতো বিলেতের আইনশিক্ষার্থীদের বার ডিনার খেতে বাধ্য

করা হতো কেন? তোকিয়োতে কিয়োতোতে আমরা সভা করেছি যত খানা খেয়েছি তার বেশী। খেতে খেতে কথাপ্রসঙ্গে এক শ' তথ্য জেনেছি, এক শ' আইডিয়া পেয়েছি। আহার তো কোথাও না কোথাও করতে হতোই। সেই কাজটি যদি এক টেবিলে বসে করা হয় তা হলে সেটি শুধু পেট ভরানো নয়, সেটি সেই সঙ্গে মন ভরানো। উপযুক্ত সঙ্গীসঙ্গিনী পেলে মন ভরিয়ে নেওয়াটাই আসল। অন্যটা তার ছল। তোকিয়োতে কিয়োতোতে কী খেয়েছি তা ভুলে গেছি, কিন্তু কী শুনেছি কী জেনেছি তা এখনো মনে আছে। সঙ্গীসঙ্গিনীদেরও মনে পড়ে। কেউ এসেছিলেন আইসল্যাণ্ড থেকে, কেউ আমেরিকা থেকে, কেউ প্যারিস থেকে, কেউ খাস জাপানী। জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বার দেখা হবে-না তাঁদের কারো সঙ্গে। জীবনকে ভরিয়ে দিয়ে ভরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা, এলুম আমি।

বড়োদায় এ রকম ছল অত বেশী জোটেনি। তবু যা জুটেছে তার পরিমাণ খুব কম নয়। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে লেখক সমাগম ঘটেছিল। ভারতের বাইরে থেকেও এসেছিলেন ভ্রাম্যমাণ লেখক। লেখক বলতে এখানে লেখিকাও বুঝতে হবে। মন ভরানো গেল খেতে খেতে। বড়োদার উদ্যোক্তারা সকলের জন্যে এক জায়গায় আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন, মুন্‌শী হল নামক ছাত্রাবাসে। এক দিকে আমিষাশী। আরেক দিকে নিরামিষাশী। বড়োদায় আমাকে দেখা গেল নিরামিষের দলে। "এ কী, ভ্রাতা! তুমি যে এবার নিরামিষাশী সাজলে!" পরিহাস করলেন নিরামিষভোজিনী সোফিয়া ওয়াডিয়া। আমি উত্তর দিলুম, "রোমে যখন যাই রোমানদের মতো করি। গুজরাতীরা নিরামিষ খেতে ভালোবাসে, তাঁদের সঙ্গে বসে খেতে আমি ভালোবাসি, গুজরাতে আমি নিরামিষাশী, জাপানে আমিষাশী।" তিনি তা শুনে মন্তব্য করলেন, "বিপজ্জনক মতবাদ!"

জাপানের মতো বড়োদাতে সভাস্থলের কানাচে কফির ক্যানটিন ছিল। জাপানে তার জন্যে পয়সা লাগত। বড়োদায় লাগত না। বরং না খেলেই ওঁরা আফসোস করতেন। এ ছাড়া সন্ধ্যাবেলা একটা করে পার্টি থাকত আর রাত্রে একটা করে ভোজ। কোনোটা মহারাজার দেওয়া, কোনোটা ধনকুবেরদের দেওয়া। মহারাজার ভোজের দিন আমি পৌঁছইনি। কুবেরদের ভোজে গিয়ে দেখেছি তাঁরা মাটির মানুষ। অসম্ভব ভদ্র। অসাধারণ বিনয়ী। আমরা যেন তাঁদের অতিথি হয়ে তাঁদের ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তাঁদের ধন্য করে দিয়েছি। পাটেলদের ভোজে বাড়ীর মেয়েরা এসে পরিবেশন করে গেলেন। ঠিক যেমন জাপানী সেনবংশের চা অনুষ্ঠানে।

কলকাতায় আমি দেরি করে যাই। অসুস্থ বোধ করি। সেইজন্যে মেলামেশার মাধ্যমগুলিতে, তার মানে পার্টিগুলিতে, উপস্থিত থাকতে পারিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গের পি. ই. এন. শাখার চা পানের আয়োজন। লোকমুখে যা শুনেছি তার উপর নির্ভর করে রায় দেওয়া বিচারকের বিবেকে বাধে। আগে থেকে মাপ চেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করছি দু'টি কথা। কুবেরদের চেয়ে বড় মহাকুবেরও আছেন কলকাতার অলকায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পূজায় পার্বণে বিবাহে শ্রাদ্ধে টাকার হরির লুট দিচ্ছেন তাঁরা। লেখকদের ব্রাহ্মণ-ভোজনে কতই বা খরচ হতো তাঁদের! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নানা প্রান্ত থেকে যাঁরা সমাগত হয়েছেন তাঁরা কি সারা কলকাতার অতিথি নন? শহরের তরফ থেকে আতিথেয়তা করবে কে, যদি ধনীরা অগ্রণী না হন? দেখা গেল সে দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার ও করপোরেশন ও কংগ্রেস। সাধুবাদ দিতে হয় এঁদের। কিন্তু এঁদের অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা কি পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করে দিয়েছেন, না কোনো মতে ক্ষুধা মিটিয়ে ধন্য হয়ে গেছেন? লেখকদের উপর শ্রদ্ধা

থাকা এক জিনিস, আর কলের মতো কর্তব্য করে যাওয়া অন্য জিনিস। রাজভবনের পার্টিতে শুনলুম রাজা নেই, মন্ত্রী নেই, উপসচিব নেই, মহাপাত্র নেই, আছেন শুধু একজন মাঝারি রকমের পাত্র। এর সঙ্গে তুলনা করুন গত বছর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবনের অভিজ্ঞতা। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি লেখকদের সম্বর্ধনা করলেন। তারাশঙ্করবাবুকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন তাঁর সঙ্গে। সে সৌজন্য লেখকদের সকলের প্রতি উদ্দিষ্ট।

আহারের প্রসঙ্গ এতবার হলো যে লোকে ঠাওরাবে সম্মেলন বলতে আমি বুঝি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার। না। তার চেয়ে বড় কথা একসঙ্গে বাস। বড়োদায় লেখকদের লেখিকাদের এক ছাদের নিচে রাখা রাখা হয়েছিল। স্থানাভাবে বা অন্য কারণে জনকয়েকের জন্যে পৃথক বাসা। একসঙ্গে থাকার ফলে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে যখন তখন দেখাসাক্ষাৎ ঘটে যেত। নরেনদার ঘরে তো লেখকরা ঢুকে পড়তেন "দেববাবু" বলে ডাক দিয়ে। এমনি করে প্রাদেশিকতার বেড়া ভেঙে যায়। যে যার কোটরে বসে থাকলে কি ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়ের সংহতি কোনো দিন শক্তিশালী হবে? লেখকদের আটপৌরে মেলামেশা অদৃশ্য হস্তে ভারতীয় জাতীয়তার বাঁধনকেও নিবিড় করেছে।

এর পরে যাঁরা লেখক সম্মেলন আহ্বান করবেন তাঁদের হয়তো ধন-বল নেই। ধনীর দ্বারস্থ হতেও তাঁদের রুচি নেই। রাজকুলের উপরেও বিশ্বাস নেই। কিন্তু আর যাই করুন বা না করুন একটি কাজ যেন তাঁরা না করেন। কলকাতার মতো শহরে নানা প্রান্তের লেখকদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখা ঠিক নয়। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হয় তাতে। সম্মেলনে যদি মেলন না থাকে তবে কী থাকে? সং? তার জন্যে এত লোক এত দূর থেকে রেলগাড়ীতে করে আসবে? রেলগাড়ী আজকাল আরামের জন্যে প্রখ্যাত নয়। বড়োদায় যেতে

আসতে আমার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তা সামলে নিতে আরো কয়েক সপ্তাহ লেগেছে। আহ্‌মদাবাদ গেলে আরেক দফা ক্ষয়-ক্ষতি হতো। সুতরাং লেখকদের যদি কষ্ট দিতে হয় তবে সেই কষ্ট যাতে পুষিয়ে যায় তার জন্যে এমন কিছু করা উচিত যাতে অন্তর ভরে উঠবে। একসঙ্গে কয়েকদিন কাটানো, এক ছাদের নিচে, এক টেবিলে, এক মোটরে—এর সুখস্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত বাসি হয় না। শুধুমাত্র সভাকক্ষে সমবেত হওয়া তো মানুষকে মানুষের নিকটতর করে না। সুতরাং সম্মেলন ডাকার কথা ভাবলেই অমনি ভাবতে হবে কোথায় এতগুলি লেখককে একঠাঁই রাখব। কোথায় সেই হোটেল বা হস্‌টেল বা ধর্মশালা বা অতিথিশালা বা বাগানবাড়ী বা আশ্রম। কলকাতায় না হলে শহরতলীতে না হলে অন্যত্র। কোথাও যদি সে রকম জায়গা না থাকে তবে বড় আকারের সম্মেলন না ডাকাই ভালো। ছোট আকারের সাহিত্য-মেলা ডাকলে চলে। সবাইকে নিয়ে নয়। বাছা বাছা লেখককে নিয়ে। বিষয় অনুসারে বাছা। নাম অনুসারে নয়।

কলকাতার আবহাওয়া লেখক সম্মেলনের উপযুক্ত ছিল না। বোধ হয় ভবিষ্যতেও হবে না। ওখানে সাহিত্য ও রাজনীতি একাকার হয়ে গেছে। জট খোলা যায় না। বোঝা ভার কোন্‌টা হচ্ছে—সাহিত্য না রাজনীতি। বিষয়নির্বাচন, বক্তা নির্বাচন এমনভাবে হয়েছিল যে এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। সাহিত্য বললে সাহিত্য। রাজনীতি বললে রাজনীতি। দুধ আর তামাক। এই যদি হয় ঐতিহ্য তবে আর সম্মেলন ডেকে কাজ নেই। তাতে সাহিত্য বেশী দূর এগোবে না। রাজনীতির দিক দিয়েও স্থায়ী লাভ হবে না। মাঝখানে থেকে লেখকরা খেলো হয়ে যাবেন। তবে পাঁচজন অবাঙালীকে পাঁচটি সিম্পোজিয়ামের সভাপতি করে ও ছ'জন বাঙালীকে সেই পাঁচটি সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধক করে কলকাতার সম্মেলনের উদ্যোক্তারা

একটি উত্তম প্রথার প্রবর্তন করেছেন। অন্যত্র এর অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। অনুসরণ যাঁরা করবেন তাঁরা শুধু মনে রাখবেন যে সিম্পোজিয়ামের সভাপতি গোড়া থেকেই তাঁর ভাষণ চুকিয়ে দেন না, মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন। আমাদের বন্ধুরা বোধ হয় মধু দিয়ে আরম্ভ করতে অভ্যস্ত। তাতে সিম্পোজিয়াম জমে না।

এর পর যাঁরা সম্মেলন আহ্বান করবেন তাঁদের জন্যেই আমার এ প্রবন্ধ। তাঁদের আর একটি কথা মনে রাখতে বলি। সিনেমায় স্টার না হলে চলে না। মূঢ় জনতা স্টার দেখবে বলেই যায়। কোন্ ছবিতে কে নেমেছে এইটেই তাদের সর্বপ্রথম ভাবনা। ছবিটা হয়তো বাজে। তার জন্যে কিছু আটকায় না। এখন এই স্টার পদ্ধতি কি সাহিত্যেও মানতে হবে? সম্মেলনে যাঁরা দর্শক বা শ্রোতা হন তাঁরাও কি জবাহরলাল ও রাধাকৃষ্ণনের নাম শুনে ভিড় করেন? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হাঁ। বড়োদাতেও হাঁ, কলকাতাতেও হাঁ। এঁরা না এলে এত ভিড় হতো না। এত চাঁদা উঠত না। এত ফোটোগ্রাফার ও এত রিপোর্টার আসতেন না। এঁদের ভাষণকে জায়গা জুড়তে দিয়ে আর সকলের বক্তৃতার জন্যে স্থানাভাব হলো সংবাদপত্রে। যে অধিবেশনের সভাপতি মামা বরেরকর ও উদ্বোধক আমি সে অধিবেশনে দশ পনেরো মিনিটের জন্যে এসে রাধাকৃষ্ণন কী বলে গেলেন দেশের লোক তা সবিস্তারে জানল। কিন্তু আসল অধিবেশনটার সম্বন্ধে এইটুকু খবর পেলো যে মামা বরেরকর সভাপতি হয়েছিলেন ও অন্নদা-শঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন বলেছিলেন। দুটি ঘণ্টার বিবরণ দু'লাইনে সারা। এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবিই নয়। যে ছবির জন্যে লোকে দাম দিয়ে কাগজ কেনে। অথচ এর জন্যে কাগজওয়ালাদের সবটা দোষ নয়। লেখক হিসাবে রাধাকৃষ্ণনের আয়তন নিশ্চয়ই বরেরকর অন্নদাশঙ্কর ইত্যাদির সমবেত আয়তনের শতগুণ নয়। তাঁর বক্তব্যের

ওজনও ততগুণ নয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণন হলেন উপরাষ্ট্রপতি। অতএব তাঁর মহিমা অপার। আমরা যে এত খেটেখুটে তৈরি হয়ে গেলুম এটা কিছু নয়। হঠাৎ এসে একটুও তৈরি না হয়ে উপরাষ্ট্রপতি যা বললেন তাই হলো মহামূল্যবান। তার আগের দিন জবাহরলালও অন্য একটি অধিবেশনের মাঝখানে হঠাৎ এসে যা মনে আসে বলে গেলেন। রিপোর্ট বেরোল প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যেকটি বাক্যের। সভাপতি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর বক্তব্যের জন্যে কতটুকু ঠাঁই হলো কাগজে? অধিবেশনের প্রধান বক্তা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হলো সব শেষে। ছাপা হলো, "তিনিও বলেছিলেন।"

অনুপস্থিত দেশবাসী সম্মেলনের প্রকৃত বিবরণ চান, কিন্তু বিকৃত বিবরণ পান, তাই তার উপর বীতশ্রদ্ধ হন। উদ্যোক্তাদের কর্তব্য বক্তাদের কাছ থেকে বক্তব্যের চুম্বক আগে থেকে চেয়ে নিয়ে কয়েক প্রস্ত নকল করিয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের দেওয়া। তা হলে তাঁরা বক্তাদের মুখে নিজেদের বানানো বাক্য বসিয়ে দিয়ে তাঁদের প্রত্যবায়ভাগী করেন না। যেমনটি হয়েছিল বড়োদায়। সেখানে আমার বক্তৃতায় বঙ্কিম রবীন্দ্রের নামগন্ধ ছিল না, বিষয়টাই অন্য। কিন্তু রিপোর্ট বেরোল স্রেফ গাঁজা। তার চেয়ে কলকাতার নাই মামা ভালো।

(১৯৫৭)

সর্বোদয়

(শ্রীঅচিন্ত্যেশ ঘোষকে লিখিত পত্র)

ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত। তাকে দেখতে আসি দু'বেলা। বিকেলে বারান্দায় বসে আপনার চিঠির জবাব দিচ্ছি। সুরজিৎ এলে তাকে বলব এ চিঠি আপনাকে দিতে।

গান্ধীজী এক একটা ইংরেজী কথার দিশী অনুবাদ করে চালিয়ে দিতেন আর লোকে মূল ইংরেজীর ভাবগত অর্থ ভুলে দিশী অনুবাদের ধাতুগত অর্থ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত। "The Kingdom of God is within you" -এর থেকে "Kingdom of God" কেটে নিয়ে বানানো হলো "রামরাজ্য।" তেমনি Ruskin-এর লেখা "Unto this last" হলো "সর্বোদয়।" Ruskin উদ্ধার করেছিলেন যীশুর উক্তি। পুরো উক্তির একাংশ। তাতে বলা হয়েছিল শেষতম ব্যক্তিরও পূর্ববর্তীদের সঙ্গে সমান অধিকার। অর্থাৎ যে পরে এসে কাজে লেগেছে সেও সমান মজুরির হক্‌দার। তাৎপর্য, সবাইকে কাজ যোগাতে হবে। মজুরি হবে সকলের সমান।

"সর্বোদয়" মতবাদ "রামরাজ্য" মতবাদের মতো যীশুখ্রীস্টের মতবাদের গান্ধীকৃত সংস্করণ। এ "রামরাজ্যে"র পিছনে ভারতীয় ঐতিহ্য নেই। তুলসীদাসের "রামরাজ্য" এ নয়। অথচ ঠিক এই ধারণাটি গান্ধীজীর শিষ্যদের তথা দেশবাসীর জন্মেছে। "সর্বোদয়ে"র পিছনেও ভারতীয় ঐতিহ্য নেই। অথচ বিনোবাজী তাকে বেদ উপনিষদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

বর্তমান জগতে Capitalism-এ Communism-এ গজকচ্ছপের

লড়াই (আপাতত ঠাণ্ডা লড়াই) চলেছে বলে তৃতীয় একটা পন্থা হিসাবে লোকে "সর্বোদয়ে"র দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু এরও তো বহু শতাব্দী ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে Early Christian-এর দ্বারা ইউরোপে। Early Gandhian-দের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কয়েকটি dogma-ই হবে সম্বল। ইতিমধ্যেই আমরা তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

তা হলে কি Capitalism-এর একমাত্র alternative হবে Communism ? তৃতীয় কোনো পন্থা থাকবে না ? নানা মুনির মুখে নানা তৃতীয় পন্থার কথা শুনে শুনে আমি শ্রান্ত। যত রকম গোঁজামিলকেই তাঁরা ভাবেন তৃতীয় এক পন্থা। সত্যিকার তৃতীয় পন্থা যদি থাকে তবে তা হচ্ছে Modernism-কে মেনে নিয়ে Moral Order (সর্বোদয়) অথবা Moral Order-কে মেনে নিয়ে Modernism (Thesis ও Antithesis-এর Synthesis). যে দিকে থেকেই দেখা যাক্ না কেন সর্বোদয়ের মূলতত্ত্ব মেনে নিতে হবে অপর পক্ষদের, আর অপর পক্ষদের মূলসূত্র মেনে নিতে হবে সর্বোদয়ীদের। গ্রাম থাকবে না শহর থাকবে, না দুই থাকবে, এ প্রশ্ন তারপর। আর মধ্যবিত্তদের মারছে কে ? মার্কিন ইংরেজ রুশ শ্রমিকদের সকলেরই "মক্কা" হলো মধ্যবিত্ত জীবন। মধ্যবিত্তে ভরে যাবে দেশ। শেষতম ব্যক্তিও হবে মধ্যবিত্ত। তা দেখে আমিই হয়তো চাষী কি মজদুর হব।

পি. জি. হাসপাতাল, কলকাতা,

২৪শে এপ্রিল ১৯৫৮

সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা

("ভারতজ্যোতি" সম্পাদককে লিখিত পত্র)

সাধুভাষা ও চলতি ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে লিখছি।

নামকরণের দোষে লোকের মনে হতে পারে চলতি ভাষা হচ্ছে অ-সাধুভাষা। তা নয়। চলতি ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যে ভাষায় আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আপনি বা আমি অ-সাধু নই। আমাদের কথাবার্তার ভাষাও অ-সাধু নয়। প্রতিদিন বাংলাদেশের উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম সর্বত্র সাধু সজ্জন যে ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা চালান, চলতি ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা। ইতিমধ্যেই এ ভাষা স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ্‌ড্‌ হয়ে এসেছে। ঢাকা চাটগাঁ তো পাকিস্তানে। ঢাকা চাটগাঁ থেকে যেসব পত্রিকা আমার কাছে আসে, যেসব বই আসে, তাতে ঢাকা চাটগাঁর উপভাষা নয় কলকাতার শিক্ষিত মহলের কথাবার্তার চলতি ভাষাই ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে দু'চারটে শব্দ স্থানীয় আঞ্চলিক। কিন্তু মোটের উপর এ ভাষা স্থানোত্তর বা অঞ্চলোত্তর। সুতরাং সাধুভাষার মতো সর্বজনবোধ্য।

যে ভাষা সর্বজনবোধ্য সে ভাষা সাধুভাষা নয় বলেই বর্জনীয় নয়। বরং সেই ভাষাই ভাবীকালের সাধুভাষা, যেমন বহু শতাব্দী পূর্বে সাধুভাষা ছিল সেকালের চলতি ভাষা। এই চল্লিশ বছরে চলতি ভাষা নিজের জোরে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে গেছে তাই নয়, কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। সাধুভাষা কি এগিয়েছে? এগিয়ে থাকলে কতটুকু আর কোন্ দিকে? চলতি ভাষার দিকেই তাকে

এগোতে হবে, যদি সে এগোয়। তখন দুই ভাষার মাঝখানে তফাৎ যা থাকবে তা খুব একটা মারাত্মক কিছু নয়। ভাষা তৈরি হয় মানুষের মুখে। লেখনীর মুখে নয়। লেখনী তাকে ধার করে নেয়, নেবার সময় বদলে দেয়। কিন্তু বদলে দিয়ে অপরিবর্তনীয় অক্ষয় অব্যয় শব্দব্রহ্ম করে তোলে না। যেমন করতে চান সাধুভাষার সাধুজীরা। পুঁথি ভিন্ন কোথাও যার অস্তিত্ব নেই তার ব্যবহার দিন দিন আরো সীমাবদ্ধ হবে। আর চলতি ভাষার ব্যবহার হবে অসীম। এতদ্ ধ্রুবম্।

আসলে তর্কটা হচ্ছে এই। শিক্ষিত লোকের কথাবার্তার ভাষা কি সেই সঙ্গে কাগজকলমের ভাষা হবে? না তার জন্যে থাকবে আর আর একটা ভাষা? কাগজী কলমী ভাষা? অতীতে ছিল, বর্তমান আছে, অতএব চিরকাল থাকবে, এ যুক্তির মহিমা আমি বুঝিনে। আয়ু ফুরিয়ে গেলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কিছুই থাকে না। সাধুভাষাও কি থাকবে!

শান্তিনিকেতন, ২৭শে জুলাই ১৯৫৮

বানপ্রস্থের পণ

জবাহরলালকে দেখে মনে হয় না যে তাঁর বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এই চির তরুণ যখন পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যান তখন নিজেকেই প্রৌঢ় বলে লজ্জা দিতে ইচ্ছা করে। যতবার তাঁর সান্নিধ্যে আসি ততবার ভাবি, আমারি বা এমন কী বয়স হয়েছে! আমিও তো তাঁর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি, তাঁরই মতো তরুণ থাকতে পারি।

কিন্তু জবাহরলালের চোখের দিকে তাকিয়ে অন্য রকম ভাব জাগে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার হলাহল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন

তিনি। সে বেদনা, সে হতাশা, সে ক্লান্তি তাঁর চোখে আঁকা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাঁর চোখে হাসে। রসিক লোক। কৌতুক তাঁর স্বভাবে। কিন্তু গাম্ভীর্য ফিরে এলেই অমনি তাঁর চোখে নেমে আসে অপরিসীম বিষাদ, প্রগাঢ় ক্লান্তি। ভিতর থেকে অফুরন্ত প্রেরণা পাচ্ছেন বলেই তিনি দম না নিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। সে প্রেরণা একজন ইতিহাসনির্মাতার। যেমন লেনিনের। কিন্তু লেনিনকেও একদিন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকতে হলো। কাজ করতে চান, অথচ কাজ করতেও পারছেন না। তেমন অবস্থায় বাঁচতে ইচ্ছা যায় না। মৃত্যু এসে মুক্তি দেয়। ইতিহাস-নির্মাতারও দম নেওয়া দরকার! প্রকৃতির নিয়ম।

জবাহরলালকেও দম নিতে হবে। না নিলে লেনিনের মতোই শয্যা নিতে হবে। তাঁর সহকর্মীরা যদি এটা সমঝে না থাকেন তো তাঁদের মতো বন্ধুদের হাত থেকে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন। এই বিরাট দেশের দীর্ঘকালস্থগিত বিবর্তন কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না, ক্রমেই বেগ সঞ্চয় করবে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। জবাহরলাল অন্তরে অন্তরে অনুভব করছেন সেই বেগের আবেগ। ধাবমান জনতার পুরোভাগে থাকতেই তাঁর মনোগত বাঞ্ছা। সুতরাং তাঁর বানপ্রস্থের পণ রাজা দশরথের মতো সিংহাসন ছেড়ে বনে যাওয়ার নয়। বনে গেলেও তিনি দম নিয়ে আবার লোকালয়ে আসবেন, সিংহাসনে ফিরে না গেলেও জনগণের পুরোভাগের সিংহ আসনে ফিরবেন। এখন তো জানা গেছে তিনি সিংহাসনেও ফিরবেন। ততদিন তাঁর খড়ম থাকবে ভারতবর্ষের ভরতদের রামভক্তির সাক্ষ্য দিতে।

তবে আমার মনে হয় না যে জবাহরলাল শুধু দম নিতেই চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত। রাজনীতি

ক্ষেত্রে ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি—বিশেষত জাতের বিচার—তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আদর্শবাদ এই কয়েক বছরে হাওয়া হয়ে গেছে। এর জন্যেও তিনি বিক্ষুব্ধ। এমনি অনেকগুলি কারণ তাঁকে বানপ্রস্থের পণ নিতে প্রবর্তনা দিয়েছিল। অপর পক্ষে পরিস্থিতি তাঁকে নিবর্তনা দিয়েছে। সহকর্মীদের কাকুতিমিনতিও গণনার মধ্যে আনতে হয়। দেশের লোকের অনুরোধ উপরোধও।

আপাতত এ সঙ্কটের অবসান হয়েছে। কিন্তু আপাতত। পরে যে কোনো দিন আবার জবাহরলাল প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতবর্ষের একজন সাধারণ প্রজা রূপে কাজ করতে চাইবেন। সেইজন্যে আরো গভীরে গিয়ে বিচার করতে হয় কোথায় তিনি বাধা পাচ্ছেন। কোন্ শক্তি তাঁকে ব্যর্থ করছে।

গত এগারো বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে নিঃসন্দেহ করেছে যে ভারতের স্বাধীনতা দৃঢ়মূল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে ভারতের সন্তানরা প্রাণ দেবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। ভারতীয়দের মধ্যে ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে দেশকে বহুখণ্ড করার খেলাও জমবে না। জনগণ তাতে ভুলবে না। ভারতে আজ এমন একটিও দল নেই যে নিজের প্রাধান্যের জন্যে দেশকে বিভক্ত করার কথা ভাবে। অবশ্য হিন্দীওয়ালাদের উপর রাগ করে অহিন্দীওয়ালারা অমন ভয় দেখিয়ে থাকে। সেটা ধর্তব্য নয়।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা যেমন দৃঢ়মূল সেক্যুলার স্টেট তেমন নয়। কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাইরে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা সেক্যুলার স্টেটকে নেহরুর একটা খেয়াল বলে উপহাস করেন। সেক্যুলার স্টেট তাঁদের চোখে মুসলিম তোষণ। শিখ তোষণ। নেহরু থাকতেই তাঁদের এই মনোবৃত্তি। নেহরু চলে গেলে যে সেক্যুলার স্টেট বিপন্ন হবে এটা আমার কাছে এখন পর্যন্ত ধ্রুব সত্য। তবে ইতিমধ্যে তাঁদের চিত্ত-

পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু এগারো বছরেও যা ঘটল না তার নিশ্চয়ই নিগূঢ় কারণ আছে। চিত্তপরিবর্তন তো ম্যাজিক নয়। যেখানে অন্তরকে অপ্রসন্ন করার মতো কারণ যথেষ্ট রয়েছে সেখানে ক্ষণকালের প্রসন্নতা কোনো কাজের নয়। সুতরাং কারণের অনুসন্ধান করা যাক।

ভারতেরই একাংশের নতুন নামকরণ হয়েছে পাকিস্তান। সেখান থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সে কথা ভোলেনি ও ভুলতে দিচ্ছে না। হয়তো ভুলত, কিন্তু এখনো বহু লোক আসছে। কোনো দিন যে আসার বিরাম হবে সে আশা ক্রমে লোপ পাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখে সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে জবাহরলালের মাথায়। সেক্যুলার স্টেটের ঘাড়ে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া যত দিন চলবে ততদিন পাকিস্তানী রাজনীতিকরা আর কোনো চাল খুঁজে না পেলে হিন্দু বিতাড়নের চাল চালবেনই। সেই ভাবে চাপ দেবেন জবাহরলালের উপর। তার পালটা চাল চালবেন ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা। মুসলিম বিতাড়নের চাল। সেটারও চাপ পড়বে জবাহরলালের উপর। অথচ কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া দশ বিশ বছরে মেটবার নয়।

কেন মেটাবার নয় তার একাধিক কারণ। একটা কারণ তো সোজা। কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গ হলে সেখান থেকে হিন্দুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে। সেইসব পলাতকদের কাহিনী শুনে ভারতের ক'জন হিন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারবে? যে ক'জনের মাথা ঠিক থাকবে সেই ক'জনেরই মাথা কাটা পড়বে। জবাহরলাল থেকে আরম্ভ করে আমার মতো অনেকের। দেশটা যদি নির্মস্তক হয় তবে তাকে চালাবে কে? অরাজকতা থেকেই পরাধীনতা ঘটেছিল। আবার ঘটতে পারে।

সুতরাং পাকিস্তান যদি কাশ্মীর পেতে চায় তবে তাকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে হিন্দুরা নিরাপদে বাস করবে, তাদের জীবিকায় ও সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হবে না, তাদের ধর্মে তো নয়ই। এ গ্যারান্টি শুধু কাশ্মীরী হিন্দুদের বেলা নয়, সিন্ধী হিন্দু, পাঞ্জাবী হিন্দুশিখ, বাঙালা হিন্দুদের বেলাও। যারা পালিয়ে এসেছে তাদের বেলাও। তার মানে দেশবিভাগের দরুণ যার যা ক্ষতি হয়েছে সব পূরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য অনুরূপ গ্যারান্টি ভারতও দেবে। এ গ্যারান্টি যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্যে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নেওয়া হবে না। তৃতীয় পক্ষকে বেবাক বাদ দিয়ে দু'পক্ষের মধ্যেই পাকাপাকি নিষ্পত্তি করতে হবে। এক কথায় কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া তখনি মিটবে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া যখন মিটবে। বড় ঝগড়াটা হলো ধর্ম নিয়ে। তার থেকেই যত দুর্ভোগ। সেটা যদি না মেটে তবে তো দুর্ভোগের শেষ নেই। ছোট ঝগড়াটা যে ভাবে মেটানোর চেষ্টা হয়েছে সে ভাবে মিটতে পারে না বলেই মেটেনি। কাশ্মীর যদি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভূস্বর্গ হয় তবে ভারতের সেক্যুলার স্টেট ধোপে টিকবে না। আর অরাজকতার ফলে দেশ আবার পরাধীন হবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রয়োজন হবে না। গৃহশত্রুরাই বহিঃশত্রুদের মালাচন্দন দিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে।

ধর্মহীন জীবন জীবনই নয়। অথচ ধর্মে ধর্মে বিবাদ মানুষের জীবনকে এমন দুর্বহ করেছে যে মানুষ এই ভুয়ো ধর্মযুগের আশু অবসান চায়। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। এটা আসলে মধ্যযুগেরই পুনরুজ্জীবন। আধুনিক যুগের মাঝখানে হঠাৎ এই মধ্যযুগীয় অধ্যায় এসে আমাদের প্রগতিকে বহুপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রেছে। মনে হয় আরো দশ বিশ বছর এর আয়ু অবশিষ্ট আছে। তৃতীয় পক্ষ সমস্ত ক্ষণ অক্সিজেন যোগাচ্ছে। জেট বোমারু বিমানও সেই অক্সিজেনের

সামিল। তৃতীয় পক্ষেরও মতি পরিবর্তন দরকার। মধ্যপ্রাচীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে ও ঘটবে তার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যযুগ আরো দ্রুত অপসৃত হবে হয়তো। আমরা তা বলে পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে পারিনে। সেক্যুলার স্টেটকে মজবুত করতে হলে যা যা করতে হবে তা করতে থাকব ।তার থেকেই আসবে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা। নান্য পন্থাঃ। জবাহরলালের এটা খেয়াল নয়। আধুনিক যুগের এইটেই নীতি।

ভারতের মাটিতে জাতীয়তাবাদ যে পরিমাপ দৃঢ়নিবিষ্ট হয়েছে সেক্যুলার স্টেট সে পরিমাণ হয়নি। আর গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের মূল কত গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে?

গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়া-নেওয়া, মাঝে মাঝে বাই-ইলেকশন লড়া, আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে মন্ত্রীমণ্ডল গড়া, অধিকাংশের সমর্থন হারালে পদত্যাগ করা, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে গণতন্ত্র আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরো দশ বিশ বছরে আরো সুদৃঢ় হবে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর ভাইমার রিপাবলিকও তো আমাদেরি মতো বহুপ্রশংশিত গণতন্ত্র ছিল। তা হলে হিটলার তাকে অত সহজে ডিকটেটরশিপে পরিণত করতে পারল কী করে? জবাহরলালের পরে তাঁরই মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অভাবে আমাদের গণতন্ত্র কি ঠিকমতো চলতে পারবে? যদি না পারে তা হলে কোনো একজন দেশী হিটলার এসে গণতন্ত্রেরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ক্ষমতার আসনে বসবে ও যে গাছের ডালে বসেছে সেই গাছকেই কেটে-সাবাড় করবে, এটা বোধ হয় অহেতুক কল্পনা নয়। আসলে আমাদের গণতন্ত্রের প্রাণ নিহিত রয়েছে জবাহরলালের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অস্তিত্বে। সেইজন্যে চার্চিল সরে গেলে ইংরেজরা চোখে আঁধার দেখে না, নেহরু সরে যাবেন শুনলে আমরা চোখে আঁধার দেখি।

সত্যিকার গণতন্ত্রের মহিমা হলো একজন নেতা না থাকলেও ছোট নেতাদের টীম সমান গৌরবের সঙ্গে খেলে যায়। নেহরুর মতো মহান নেতা নিকট ভবিষ্যতে উদয় হবেন না, এটা স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি। তিনি যখন অমর নন তখন ছোট ছোট নেতাদের দিয়েই গণতন্ত্র চালিয়ে যেতে হবে। তাঁরা যদি লোকের শ্রদ্ধা না পান, যদি নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারেন, তা হলে গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রইলেও ভিতরে ভিতরে বল কমে আসবে। তখন কে একজন হিটলার এসে সর্দারতন্ত্র স্থাপন করবে। আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রকে এতখানি মূল্য দিতে শিখিনি যে তার জন্যেও প্রাণ দিতে পারি। তার জন্যে বড় জোর ভোট দিতে পারব। দেশের লোকের ধারণা একবার ভোট দিতে পারলে পাঁচ বছরের মতো সকলের সব দায়িত্ব চুকে গেল, তারপর যত কিছু দায়িত্ব জবাহরলালের মতো মহানেতার। কিন্তু তিনি না থাকলে? তিনি না থাকলে ভেউ ভেউ করে কাঁদা যাবে। তারপর কোনো একজন মায়াবী হঠাৎ আবির্ভূত হলে তাকে মাথায় করে নাচা যাবে।

না, সতিকার গণতন্ত্র এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণ অত্যন্ত বেশী নেতৃনির্ভর। সর্দারতন্ত্রই এ দেশের ললাটলিখন, যদি না ছোট ছোট নেতাদের টীম যোগ্যতার সঙ্গে খেলতে অভ্যস্ত হয় ও লোকের আস্থা পায়। সময় থাকতে এর উদ্যোগ করতে হবে। নেহরু কি বুঝতে পারছেন না তাঁর পরে দুটিমাত্র সম্ভাবনা আছে? এক হলো ছোট ছোট নেতাদের টীমওয়ার্ক। আরেক হলো দেশী হিটলারের সর্দারি। গণতন্ত্রের প্রতি দরদ থাকলে তাঁরই তো কর্তব্য ছোট ছোট নেতাদের শিখিয়ে পড়িয়ে এমনভাবে মানুষ করে দেওয়া যে দেশের শাসন এক দিনের জন্যেও দুর্বল বা বিশৃঙ্খল হবে না, পলিসি ভ্রান্ত হবে না, অগ্রগতি ব্যাহত হবে না। এদিক থেকে চিন্তা করলে ভরতকে খড়ম ধরিয়ে

দিয়ে কিছুকালের জন্যে বনে যাওয়াও বাঞ্ছনীয়। গেলে পাঁচ সপ্তাহ বা পাঁচ মাসের জন্যে নয়। বছর দুয়েকের জন্যে। তাঁর যদি সে-পরিমাণ মনের জোর না থাকে তবে লোকের মনেও সংশয় থেকে যাবে যে নেহরুর পর দেশ হয়তো চলবে না। যারা দু'বছরও চালাতে পারে না তারা কোন্ দরের লোক ? কে তাদের মানবে ?

আরো ভাবনার কথা যে আমাদের জাতীয় ঐক্য নেতিবাচক। অর্থাৎ বাইরে থেকে আঘাত এলে আমরা এক হয়ে লড়তে পারি। কিন্তু তেমন পরাক্রান্ত শত্রু যদি না থাকে তবে আমরা শত ভাগে বিভক্ত হই। টীম গড়তে জানিনে। এই যে কংগ্রেস এ তো গড়ে উঠেছিল বহিঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজনে। এখন ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়, তাই কংগ্রেসও তার ঐক্য রাখতে পারছে না। ঐক্য যেটুকু দেখছি সেটুকু দেখছি সেটুকু ইংরেজ আমলের সংগ্রামী নেতাদের অস্তিত্বের কল্যাণে। ইতিবাচক ঐক্য কেমন করে হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া চাই। শুধুমাত্র একটা প্রোগ্রাম কি একটা মহাজাতিকে সংহত করতে পারে, একত্ববোধ যোগাতে পারে ? সংগ্রাম ও প্রোগ্রাম— শুনতে অনেকটা এক। কিন্তু ওজন সমান নয়। সংগ্রাম যতটা শক্তি সঞ্চার করে প্রোগ্রাম ততটা নয়। সেইজন্যে কংগ্রেসের বাইরে কয়েকটি দল সংগ্রামের উপরেই জোর দিচ্ছে। কেউ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, কেউ ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। এও নেতিবাচক ঐক্য। এদের ঘরেও একই সমস্যা দেখা দেবে। এরাও শত ভাগ হবে।

ইতিবাচক ঐক্য কেমন করে হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও দু'বছর নিভৃতে ধ্যান করা দরকার। হৈ হৈ করে দেশময় ঘূর্ণি হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়ানো বৃথা। গণসংযোগে আর যাই হোক এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। রুশ আর চীন সংগ্রাম করছে প্রতি মুহূর্তে, তাই তাদের মনে এ প্রশ্ন নেই। সংগ্রামের শেষে তাদের বেলাও এ

প্রশ্ন উঠবে। আমরা তো সংগ্রাম করছিনে। আমাদের বেলা এ প্রশ্ন দিন দিন আরো জরুরি হবে। প্রোগ্রাম দিয়ে সংগ্রামের মতো সংহতি জাগিয়ে তোলা যায় না। রুশচীনের পঞ্চবার্ষিক যোজনা সংগ্রামের অনুরোধে। আমাদের তা নয়। মোট কথা জবাহরলালকে ভাবতে হবে। তাঁর অন্তরও সেই নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর দোটানার অন্ত নেই। তাঁর বন্ধুরাও নাছোড়।

(১৯৫৮)

সাহিত্য রচনায় এযুগের বাঙালী

এ যুগ বলতে আমি বুঝি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পরবর্তী কাল। যেদিন বাংলা যুগপৎ বিভক্ত ও স্বাধীন হয়। আমাদের সব চেয়ে লজ্জার ও সব চেয়ে গৌরবের দিন।

এ যুগের বাঙালী দুই নৌকায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটির নাম ভারত। অপরটির নাম পাকিস্তান। যে কোনো দিন দুই রাষ্ট্রে লড়াই বেধে যেতে পারে। তখন ভাগের মা পাবেন রক্ত গঙ্গা। কিংবা লড়াই বাধবে দুনিয়া জুড়ে রাজায় রাজায়। প্রাণ যাবে উলুখাগড়ার। নিরপেক্ষ থেকে এ পারের উলুখাগড়া বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু ও-পারের উলুখাগড়ার জীবনসংশয়। ওরা তো নিরপেক্ষ নয়। ওদের সর্বনাশে বাঙালীর এক ভাগের সর্বনাশ। সেই ভাগটি বৃহত্তর। বাঙালী বলতে যাঁরা শুধু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বোঝেন, বড় জোর তার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জুড়ে দেন, আমি তাঁদের একজন নাই। যারা ও-পারে বাস করে তারাও বাঙালী। এবং বঙ্গ বলতে যেহেতু আদিতে পূর্ব বঙ্গই বোঝাত সেহেতু তারাই আদি বাঙালী। তা ছাড়া

বাংলাদেশের মহত্তর অংশ তো ও-পারেই। যেখানে বিবর্তিত হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা শত শত বর্ষ ধরে। যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মা ও যমুনা, মেঘনা ও সুরমা।

সাড়ে চার কোটি বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে বাকী আড়াই কোটি বাঙালী এমন কী ভবিষ্যৎ আশা করতে পারে ইতিহাসের কাছে! নিজেদেরকেই ষোলো আনা লোক ও নিজেদের রাজ্যকেই ষোলো আনা দেশ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হলে মানুষ রিয়ালিটি ছেড়ে আন্‌রিয়ালিটির আফিং ধরে। যেমন ধরেছেন চিয়াংকাইশেক ও তাঁর দলবল। তাঁদের তবু একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আছে, সৈন্যসামন্ত আছে, পতাকা আছে। আমাদের তেমন কিছু নেই। আমরা যারা পশ্চিম বঙ্গে বাস করি তারা ভারত রাষ্ট্রের প্রজা। রাজ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু রাষ্ট্র স্বতন্ত্র নয়। রাষ্ট্র বাঙালী বিহারী অসমিয়া ওড়িয়া প্রভৃতির এজমালি।

উপরে আমি দুই নৌকার উপমা দিয়েছি। নৌকা দু'খানার প্রত্যেকখানাই দোতালা। ভারত নামক নৌকাটির নিচের তলায় গোটা পনেরো ষোল কামরা। তারই একটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে থাকে বাঙালী। আর উপরের তলায় প্রকাণ্ড একটা বৈঠকখানা। সেখানে বসে বাঙালী বিহারী মরাঠা গুজরাতী প্রভৃতি যাবতীয় ভারতীয়। সেখানে আসন নিতে গেলে বাঙালী বলে নয়, ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে হয়। ভারত রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি জাতিকেই স্বীকার করে। তার নাম ভারতীয় জাতি। বাঙালী ইত্যাদি জাতির স্বীকৃতি সংবিধানের কোনোখানে নেই। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আছে, কিন্তু তার সঙ্গে জাতীয়তা যুক্ত নয়।

এমন কি পশ্চিম বঙ্গ যে বাঙালীর এ কথাও সংবিধানে লেখে না। সারা ভারতরাষ্ট্রটাই সব ভারতীয় নাগরিকের। সেই সূত্রে পশ্চিম বঙ্গও মাড়োয়ারীর। মাড়োয়ারও বাঙালীর। এযুগের বাঙালীকে সারা

ভারতটাই লিখে দেওয়া হয়েছে। সে যদি দখল নিতে সমর্থ হয় তো নিতে পারে। তেমনি তামিল তেলেগুদেরও লিখে দেওয়া হয়েছে সারা ভারত। তারা ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলকাতার দখল নিয়েছে। আর মাড়োয়ারী বিহারীরা উত্তর কলকাতার। তা সত্ত্বেও মোটামুটি এ কথা ঠিক যে নিচের তলাটা এখনো বাঙালীর আর উপরের তলাটা সব ভারতীয়ের এজমালি। ক্ষমতা ভাগ করার সময় সংবিধান দিয়েছে উপরের তলাকেই অসীম ও অপরিমিত ক্ষমতা, আর নিচের তলাকে সীমাবদ্ধ ও পরিমিত ক্ষমতা। সেইজন্যে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা নিতে পারেন কেবল ছোট ছোট সিদ্ধান্ত। যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি বড় বড় সিদ্ধান্ত নেবার মালিক নিখিল ভারতের মন্ত্রীরা। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যা বললুম তা বলতে পারা যায় পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধেও। আর ভারত রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা বললুম তা পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্বন্ধেও। কোনোখানেই বাঙালী অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়, বড় বড় সিদ্ধান্তের মালিক নয়। তবে অবাঙালীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতীয় বা পাকিস্তানী হিসাবে অসীম ক্ষমতার শরিক হওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে বাঙালী চেতনাকে ভারতীয় বা পাকিস্তানী চেতনায় পরিণত করতে হবে। চেতনাকে বাঙালীর চেতনা রেখে উপরের তলায় যাবার জো নেই।

সাহিত্যের আলোচনায় এসব কথা আসছে কেন? আসছে এই জন্যে যে সাহিত্য সৃষ্টির মূলে চেতনা। চেতনা ব্যক্তিনিবদ্ধ নয়। বাংলা সাহিত্যে বাঙালী চেতনা সক্রিয়। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী চেতনা মাথা ঠুকে মরছে, কারণ নিচের তলার ছাদটা নিচু। কামরাটা ছোট। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে আমরা সচেতন হতে বাধ্য যে আমাদের বাড় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যিক যদিও রস আর আলো নিয়ে কারবার করে তবু মাটির নিয়ম তার মধ্যেও কাজ করছে। সে হাজার চেষ্টা করেও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না। যদিও তাকে

উঠতেই হবে। নয়তো সে পাখীর মতো গান করতে পারবে না। ফুলের মতো ফুটতে পারবে না। তারার মতো জেগে থাকতে পারবে না। স্রষ্টার মতো লীলা করতে পারবে না। সাহিত্যিক যদি আশা করে বসে থাকে যে একদিন পারিপার্শ্বিক অবস্থা শোধরাবে তা হলে সে আয়ুক্ষয় করছে। পশ্চিমবঙ্গ এত সংকীর্ণ আর এত বোঝাই আর এত স্বল্পক্ষম যে বাঙালীর চেতনা চার দিকে মাথা ঠুকে ঠুকে কোথাও কিছু ভাঙতে পারবে না, ভাঙলে তার নিজের মাথাটাকেই ভাঙবে। একটিমাত্র দরজা খোলা আছে। সেটি চেতনাকে সম্প্রসারিত করে ভারতীয় চেতনায় পরিণত করা। উপরের তলায় যাবার দরজা। সেখানে বাঙালী হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে গেলে অবারিত বিকাশ, কোথাও মাথা ঠেকে যায় না। কিন্তু সেখানে গেলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি মেনে নিতে হবে। বারোয়ারি সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতি।

উপরের তলায় যাওয়া মানে কি বাংলার বাইরে যাওয়া? সব সময় নয়। উপরের তলাটা সারা ভারত জুড়ে রয়েছে। বাংলা তার বাইরে নয়। যে যেখানে আছে সেখানে থেকেও চেতনাকে ভারতীর চেতনা করতে পারে। তা যদি করে তা হলে এমন নিরাশাবাদী হতে হয় না। নিখিল ভারতীয় যতগুলি প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকটিতে বাঙালীর সম্মানের আসন। কয়েকটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে আসা গেল। কিন্তু এর একটা অলিখিত নিয়ম হলো ইংরেজীতে কিংবা হিন্দীতে কথা বলা। হিন্দীর চেয়ে ইংরেজীতেই বাঙালীর অবলীলা। ইংরেজী ছেড়ে দিলে বাঙালী পিছনের সারিতে বসবে। আর এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে ব্রিটিশ আমলে ভারতের সর্বত্র বাঙালী যে সমাদর পেয়েছে সেটার বড় একটা কারণ সে ইংরেজীনবিশ? বাঙালী যদি বাস্তববাদী হয়ে থাকে তবে ইংরেজীকে

এত শীঘ্র বিদায় দেবে না। যদি দেয় তা হলে যেন হিন্দীর জন্যে প্রস্তুত হয়। নিখিল ভারত তৃতীয় কোনো ভাষাকে সার্বিক মর্যাদা দেবে না।

তবে সাহিত্যকে দিতে পারে সার্বিক মর্যাদা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপন্যাস ছোটগল্প এখন অনুবাদের সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় সাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তো অনুবাদ বলেই মনে হয় না। মৌলিক বলেই মনে করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠক-পাঠিকা। শরৎচন্দ্রের মতো আত্মীয়তা কেউ কখনো পাতাতে পারেননি জয়দেব ও তুলসীদাসের পরে। শরৎচন্দ্রের নায়কনায়িকা যে বাঙালী তাও কেউ গণনায় আনতে চায় না। নামধাম বদলে দিয়ে তাদের মরাঠা বা গুজরাতী বানায়। তারাও কেমন করে বনে যায়। এর থেকে বোঝা যায় ভারত তলে তলে এক। আমরা একটাই জাতি ভারত জুড়ে আছি, যদিও আমাদের ভাষা আলাদা, প্রথা আলাদা, রুচি আলাদা। তাই যদি না হতো রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী কেমন করে ভারতের সব প্রান্তের সব গ্রামের আপনার হতো? রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কেমন করে সার্বজনীন হতো? সাহিত্য বাংলার হয়েও ভারতের হতে পারে, যদিও ভাষা তত দূর যাবে না, যেতে পারে না।

আমাদের সাহিত্যের বাণী ইতিমধ্যে ভারতের বহু অঞ্চলে পৌঁছেছে। অন্যান্য সাহিত্যের বাণী কিন্তু আমাদের এ দিকে বিশেষ পৌঁছয়নি। সামনের কয়েক বছরে শত শত বাংলা বই অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় তর্জমা করাতে হবে। তেমনি শত শত হিন্দী বই, তামিল বই, মরাঠী বই, উর্দু বই বাংলা ভাষায়। এটা যে কেন এত দিন হয়নি তার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ইউরোপে এক ভাষার বই অন্য দশটা ভাষায় তর্জমা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অনুবাদের উপযুক্ত বই অন্যান্য ভারতীয়

ভাষায় বড় কম নেই। বাঙালীর আগ্রহের অভাব। কিংবা একটা মিথ্যা জাতীয়তার অহঙ্কার এর জন্যে দায়ী। এক নৌকায় ভাসব অথচ পর ভাবব সবাইকে! সুখের বিষয় হিন্দী থেকে তর্জমা কিছু কিছু হচ্ছে। অন্যান্য সাহিত্য থেকেও হওয়া চাই।

ভারতীয় চেতনার পক্ষে এত কথা বলা হলো যুগের প্রয়োজনে। এর থেকে যেন কেউ না মনে করেন যে বাঙালী চেতনাকে খাটো করতে বলছি। ঐতিহাসিক বঙ্গভূমি এগারো বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। ভৌগোলিক বঙ্গভূমিও দ্বিখণ্ডিত। তা সত্ত্বেও আইডিয়াল বাংলাদেশ আমাদের চেতনা অধিকার করে আছে ও থাকবে। রাজনীতি অর্থ-নীতির বেলায় এই আইডিয়ালের রূপায়ণ সম্ভব নয়। র‍্যাডক্লিফ নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আমরা পা বাড়াতে পারিনে। এপারে পালিয়ে এলে ব্যক্তিদের আমরা কিছু উপকার করতে পারি, কিন্তু ও-পারে যে ভূখণ্ড পড়ে আছে তাকে আমরা মনের মতো করে গড়তে পারিনে। আমাদের সে ক্ষমতাই নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা এ কথা খাটে না। সাহিত্য কেউ ভাগ করে দেয়নি, আমরাও ভাগ করে নিইনি। সাহিত্যে আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের আইডিয়াল বাংলাদেশের সমস্তটায় রূপায়ণ ঘটাতে পারি, সৃষ্টি করতে পারি এমন সাহিত্য যা সারা বাংলাদেশের সকলের সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পিছনে যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পটভূমিকা ছিল আমাদের পিছনে তা নেই। আমরা গত এগারো বছরের পূর্ববাংলার ইতিহাস জানিনে, তার বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত নই, সেখানে যেতে আমাদের মানা। তা সত্ত্বেও আমরা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অন্বয় রক্ষা করে চলেছি। দেশ ভাগ হয়েছে বলে আমাদের চেতনা ভাগ হয়নি, চেতনাস্রোতে ছেদ পড়েনি।

কিন্তু দিন দিন পূর্ববঙ্গের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এক পুরুষ বাদে এমন লেখক ক'জন থাকবেন যাঁরা পূর্ববঙ্গে বাস করেছেন বা পূর্ব-

বঙ্গ ভালো করে দেখে এসেছেন? সুতরাং সাহিত্যেও বিচ্ছেদ অনিবার্য। যদি না পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান সম্পর্ক শোধরায়। 'বাঙালী' 'বাংলা' প্রভৃতি শব্দ ক্রমেই তাদের প্রচলিত সংজ্ঞা হারাবে। চেতনাও সংকীর্ণ হবে। সাহিত্যরচনা ও সাহিত্য-চর্চা ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা শাসিত হবে। সাহিত্যের ইতিহাস 'পশ্চিম' চিহ্নিত হবে। 'পূর্ব' চিহ্নিত হবে। চেতনাস্রোতে ছেদ পড়বে। জার্মানীতে অস্ট্রিয়াতে একই জার্মান সাহিত্য। তবু একই ধারা নয়। একই চেতনা নয়। সাহিত্যিকরাও ইতিহাস ভূগোল অতিক্রম করতে পারেন না। খণ্ড চেতনার সঙ্গে খণ্ড চেতনা জুড়ে অখণ্ডের উপলব্ধি সম্ভব নয়।

যে সমস্যা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের যুগে ছিল না সে সমস্যা আমাদের যুগে দেখা দিয়েছে। রাজনীতিকদের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই, তাঁরা রিয়ালিস্ট। আমাদের আছে, আমরা আইডিয়ালিস্ট। রিয়ালিটিকে আমাদের আইডিয়ালের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাই। তা বলে রিয়ালিটির থেকে দূরে সরে থাকতে পারিনে। ইতিহাসে ভূগোলে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ছাপ সাহিত্যিকের চেতনাকেও স্পর্শ করবে। অবশ্য তা সত্ত্বেও উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে, হচ্ছে ও হবে। মাথাব্যথা থাকলেও মাথা তো থাকতে পারে, আছে ও থাকবে।

এবার বলি পূর্ববাংলার কথা। পূর্ববাংলা এখন অন্য রাষ্ট্রের অঙ্গ। সে রাষ্ট্র আবার বৈরীভাবাপন্ন। কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। এ তরফ থেকে যে কোনো দিন কোনো রকম অন্যায় ঘটেনি তা নয়। আমরা সাহিত্যের কারবারী, আমাদের উচিত সাহিত্যের খবর রাখা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাময়িক পত্রগুলির কোথাও কি ভুলে পূর্ববাংলার সাহিত্যের খবর ছাপা হয়? রাজনৈতিক জ্ঞাতিবিরোধের দরুন কি কেউ কখনো এ পরিমাণ আত্মবিস্মৃত হয় যে নিজের সাহিত্যের

এক অংশের বার্তা রাখে না, রাখতে চায় না? পূর্ববাংলা আছে ও থাকবে। সেখানকার হিন্দু-মুসলমান আছে ও থাকবে। সেখানকার সাহিত্য আছে ও থাকবে। নেলসনের মতো কানা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে অর্ধেকের বেশী বাঙালীকে নেই বলে উপেক্ষা করা যাবে না। তাদের জীবনের সংবাদ দিতে হবে। তাদের সাহিত্যের সমাচার পেতে হবে। আমাদের কতক লেখককে এই নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে, ওয়াকিবহাল হতে হবে, লিখতে হবে। প্রত্যেক পত্রিকারই একটি পূর্ববাংলা বিভাগ থাকলে ভালো হয়। তাতে থাকবে সেখানকার সাহিত্যের খবরাখবর।

আমার পূর্বপাকিস্তানী বন্ধুরা আমাকে ভুলে যাননি। প্রায়ই পাঠিয়ে দেন পত্রিকা ও পুস্তক। লক্ষ্য করছি তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের চলতি ভাষাকেই তাঁদেরও চলতি ভাষা করে নিয়েছেন। যেসব নাটক তাঁরা অভিনয় করেন সেসবও পশ্চিমবঙ্গের বা অবিভক্ত বঙ্গের নাটক। অভিনয়ে মুসলমান মেয়েরাও নামেন। তার চেয়ে ও আশ্চর্যের কথা, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক নায়িকা যদিও হিন্দু তার নাট্যরূপের অভিনেতা অভিনেত্রী মুসলমান তরুণ তরুণী। যুগপরিবর্তন যে হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবে কে? পূর্ববাংলার সাহিত্যিকদের আরবী ফারসী প্রীতি এখন অতীতের বস্তু। তাঁরা উর্দু বিরোধী হতে গিয়ে আরবী ফারসীর মায়া কাটিয়েছেন। বরং সংস্কৃতের দিকেই তাঁদের প্রবণতা। তবে টানটা মাটির দিকেই, লোকসাহিত্যের দিকেই বেশী। ইদানীং 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ও 'কাশবনের কন্যা' বলে দুটি উপন্যাস আমাকে মুগ্ধ করেছে। ছোটগল্পে পূর্ববাংলার লেখকদের কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম নয়। ঢাকা চট্টগ্রামে আজকাল বইকেতাবের ছাপা ও বাঁধাই খুব ভালো হয়। কিন্তু খবরের কাগজে ছাপা ভালো নয়। তবে ছাপা ভালো না হলেও লেখা যেমন তাজা তেমনি

জোরালো। আমি অনেক সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে লেখকের প্রাণে জ্বালা থাকলে লেখায় অপূর্ব তেজ আসে। এ তেজ আমি পশ্চিমবঙ্গে দেখিনে।

পূর্ববাংলার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এক নয়। এখনো সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কবে হবে কেউ জানে না, বলতে পারে না বিপ্লবের সম্ভাবনা আকাশে বাতাসে। পূর্ববাংলার সাহিত্যিকদের সম্মুখে সঙ্কট। তাঁদের মধ্যে এখন আর সাম্প্রদায়িকতাবাদী কেউ নেই। সুতরাং তাঁদের প্রতি বৈরীভাব আমাদের কারো হৃদয়ে থাকার হেতু নেই। সেতুবন্ধনের ভার রাজনীতিকদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে আমাদের হাতে নিতে হবে।

(১৯৫৮)

শিক্ষার মাধ্যম

শিক্ষা বলতে যদি বৃত্তি শিক্ষা বোঝায় তা হলে তার উদ্দেশ্য কর্মে কুশলতা। কিন্তু সাধারণত আমরা শিক্ষা বলতে বুঝি অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে, দেশ ও জগৎ সম্বন্ধে, দেশকালাতীত সত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। জ্ঞানলাভের সাধারণ পদ্ধতি বিদ্যালয়ে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে গ্রন্থপাঠ। এসব গ্রন্থ মাতৃভাষায় লিখিত হলেই ছাত্রছাত্রীর সুবিধা। শিক্ষকেরও সুখ।

সমস্ত সভ্য দেশে এইটেই নিয়ম। আমাদের দেশ কি সৃষ্টিছাড়া যে এখানে এ নিয়মে খাটবে না? কিন্তু দেশ সম্বন্ধে যদি কেউ স্বেচ্ছায় অন্ধ না হয়ে থাকেন তবে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে প্রথমত এ দেশ বহুভাষিক, দ্বিতীয়ত এ দেশ পশ্চাৎপদ। তার মানে এদেশের

প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাভাষী ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। এবং ইংলণ্ড আমেরিকা জার্মানী প্রভৃতি দেশের তুলনায় এ দেশ জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে বাণিজ্যে পেছিয়ে রয়েছে। যাদের উপর একে এগিয়ে দেবার ভার আজ বাদে কাল পড়বে সেই সব তরুণতরুণীকে ইংরেজ, মার্কিন, জার্মানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা অহরহ স্মরণ রাখতে হবে। আজকের দুনিয়ায় বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার দায় থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। আমরা অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছি বলে প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত হইনি। বাইরের লোকে জানতে চায় কোথায় আমাদের দার্শনিক, কোথায় বৈজ্ঞানিক, কোথায় ঐতিহাসিক? কবি, সঙ্গীতকার, অভিনেতা এঁরাই বা কোথায়? কী দরের? বিশ্বসভায় কার কত উচ্চে আসন? প্রথম সারিতে কে কে?

সুতরাং মাতৃভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপনা স্বাভাবিক হলেও শর্তহীন নয়। প্রথম শর্ত এই যে বাঙালী অবাঙালী বিভিন্ন ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন মাধ্যমে পড়াতে হবে অথচ পরীক্ষায় একই স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে হবে। এটা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় শর্ত এই যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত অসংখ্য পুস্তক ও পত্রিকা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তর্জমা করতে হবে ও সে সকল তর্জমায় মূলের গুণ অবিকৃত থাকবে। এটাও প্রায় অসম্ভব। সেকালের ম্যাট্রিকের সঙ্গে একালের স্কুল ফাইনাল পাস করা ছেলেমেয়েদের তুলনা করলে বোঝা যাবে এরা কত কম জানে ও ভাবে। সুতরাং বিনা শর্তে মাতৃভাষার প্রবর্তন সমর্থনযোগ্য নয়। আগে শর্তপূরণের ব্যবস্থা করা হোক। যতদিন না তা হয়েছে ততদিন অপেক্ষা করাই সমীচীন।

জাতীয়তার অনুরোধে যাঁরা হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে চান তাঁদের পক্ষে যে যুক্তি নেই তা নয়। কিন্তু তাঁদের বিপক্ষে মোক্ষম যুক্তি হিন্দী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়। একই পরিশ্রমে যদি ইংরেজী

শিখে নিতে পারি ইংরেজীর খোলা জানালা দিয়ে শতগুণ দেখতে পাব ও সেই পরিমাণে এগিয়ে যাব। হিন্দী শেখা ভালো, কিন্তু তাকে শিক্ষার মাধ্যম করা ভালো নয়। মাতৃভাষা যতদিন না মাধ্যম হয়েছে ততদিন ইংরেজী মাধ্যম শ্রেয়।

(১৯৫৮)

আচার্য যত্নাথ সরকার

আচার্য যত্নাথের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যকাল থেকে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র মাধ্যমে। মনে আছে একবার তিনি 'প্রবাসী'তে প্রস্তাব করেছিলেন যে ইংরেজী হোম ইউনিভার্সিটি সিরিজের অনুরূপ বাংলায় একটি পুস্তকমালা প্রকাশ করা হোক। সেই পুস্তকমালায় কোন্ কোন্ বিষয়ে বই থাকবে তারও তিনি একটি তালিকা দিয়েছিলেন। কে কোন্ বই লিখবেন তারও ইঙ্গিত ছিল স্থানে স্থানে। ফরাসী বিপ্লবের উপর স্বয়ং যত্নাথ।

সকলেই জানেন তিনি ভারতীয় ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অথরিটি। কেবল আওরংজেবের কাল নয়, গোটা মুঘল রাজত্বটাই ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক ভারত সম্বন্ধেও তাঁর প্রচুর কৌতূহল ছিল। ১৯২১ সালে যখন আমি কটক কলেজ আই. এ. পড়ি তখন আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি কিছু দিন আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। হয়তো প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে, কিন্তু আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে নয়। দু'বছর পরে যখন পাটনা কলেজ বি. এ. পড়ি তখন সেখানের তাঁকে পাই। তিনি আমাদের পড়াতেন ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত। আমার

মনে হয় সেইটেই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তা ছাড়া একবার তিনি আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসও নিয়েছিলেন। অপর অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে। তখন লক্ষ্য করেছি এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডও তাঁর দিব্য জানা।

ক্লাসে এসেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে চক দিয়ে তিনটি কি চারটি সরল রেখা টানা। খবরের কাগজের স্তম্ভের মতো ভাগ করা। একের পর এক স্তম্ভ পরিপাটি ইংরেজী হস্তাক্ষর দিয়ে পূরণ করা। আমরা যে যার খাতায় নোট করে নিতুম। কিংবা শুধু পড়ে যেতুম। তার পর তিনি ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। তাঁর রচনায় ও ভাষণে প্রসাদগুণ থাকত। ইংরেজীর উপর তাঁর অসামান্য দখল। কিন্তু যেটা আমাকে অবাক করত সেটা তাঁর চিন্তায় ও বাক্যে সব সময় নির্ভুল ও নিখুঁৎ হবার প্রয়াস, precise হবার প্রয়াস। এ গুণ আমি সাহিত্যিকদের মধ্যেও কম দেখছি। এ গুণ সাধারণত বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়। আচার্য যদুনাথের মনের গঠনটা বৈজ্ঞানিকের মতো। ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি অপ্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃতকে এক ইঞ্চি জায়গা দেননি। তাঁর অনেক তথ্য হয়তো ধোপে টিকবে না, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি ত্রুটিহীন।

কটক কলেজের খেলার মাঠে একদিন দেখি প্রৌঢ় অধ্যাপক যুবকের মতো উৎসাহে ফুটবল খেলার রেফারি হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন, হুইসল দিচ্ছেন। খেলার শেষে তাঁর গলদ্ঘর্ম দশা দেখে দুঃখিত হয়েছি। খেলা তাঁর কাছে নেহাত খেলা ছিল না। তার নাম ব্যায়াম। শরীর-চালনা। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। নিয়মিত শরীরচালনার পুণ্যবলে তিনি অতি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষম ছিলেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাঁকে দেখেছি, তিনি অষ্টাশি বছর বয়সেও তেমনি ঋজু ছিলেন। তেমনি সপ্রতিভ।

তাঁর নিয়ম কিছুতেই ভঙ্গ হবার নয়। ঘড়ির কাঁটার মতো জীবন যাত্রা। শেষ বয়সে একবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল তিনটের সময়। আমি গিয়ে পৌঁছলুম দেরিতে। তিনি ততক্ষণে চলে গেছেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে। পরে আবার গেলুম। বললেন, "তোমার জন্যে আমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেছিলুম।" কয়েক মিনিট তাঁর কাছে বড় বেশী সময়। আই. এ. পরীক্ষার পর যখন তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে যাই তিনি আমাদের বসিয়ে রাখলেন না, তৎক্ষণাৎ দেখা করলেন, সৎ পরামর্শ দিলেন, দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিদায় দিলেন। এই সময়বোধ পরে কত বার লক্ষ্য করেছি। তাঁর মনে মনে একটা হিসেব ছিল, সেটা অতিক্রম না করা তক আমরা স্বাগত, অতিক্রম করলেই আমরা অবাঞ্ছিত। ছাত্রমহলে এর মহিমা বুঝবে কে? অধিকাংশের চোখেই তিনি ছিলেন অপ্রিয়। কিন্তু পরিমিত সময়ের মধ্যে তিনি যা বলতেন তা মনের পক্ষে পরম পুষ্টিকর। স্মৃতির পক্ষে দুর্লভ সম্বল।

আচার্য যদুনাথের মতো মহৎ অধ্যাপক কোথায় পাব? তাই ইতিহাসে অনার্স নেবার কথা ভেবেছি। তা হলে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য হওয়া যেত। পরে স্থির করি ইংরেজীতে অনার্স নেব। পাস কোর্সের অন্যতম বিষয় হবে ইতিহাস। ফলে কেবল ফরাসী বিপ্লবের ক্লাসেই তাঁকে পাওয়া যেত। ততদিনে তিনিও পাটনা কলেজে, আমিও পাটনা কলেজে। বড়দিনের সময় ইতিহাসের ছাত্ররা প্রত্যেক বছর দেশভ্রমণে যেত। সেবার আমাদের সারথি হলেন আচার্য যদুনাথ। তাঁর সঙ্গে আমরা চললুম বারাণসী, দিল্লী, আগ্রা। সমস্ত প্রোগ্রামটা তাঁরই পরিকল্পনা। নিপুণ সেনাপতির মতো তিনি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিজেই ঠিক করে দেন। খাওয়া শোওয়া দৃশ্য দেখা সমস্ত তাঁরই পরিচালনায়। তিনিই আমাদের গাইড। কোথায় কী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল তা

তিনি স্বয়ং আমাদের শোনান ও বোঝান। তাঁর চোখে চোখে থাকি। কাছে কাছে ঘুরি। তাঁকে আপনার করে পাই।

সেবারকার সব কথা আমার মনে নেই। কিন্তু কয়েকটি মজার মজার কথা ভুলিনি। দিল্লী স্টেশনে আমাদের ট্রেন পৌঁছয় বেশ একটু রাত করে। আচার্য বললেন, "কুলি করা হবে না। যে যার জিনিস হাতে হাতে নিয়ে আমার পিছন পিছন এসো। টাঙ্গা করা হবে না, পায়ে হেঁটেই হোটেলে যাওয়া যাবে।"

আমাকে কেউ তাঁর বডিগার্ড হতে বলেনি। আমি স্বেচ্ছায় হয়েছি। তিনি জোরে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমিও জোরে এগিয়ে যাচ্ছি। গেটের কাছাকাছি এসে তিনি বললেন, "কই? আর সবাই কোথায়?" কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল জনা দুই কুলী মাথায় কাঁধে কাঁখে ও হাতে আমাদের দলের মালপত্র বয়ে আনছে। আর যায় কোথায়! যদুনাথ তো রেগে টং। রাগের সমস্তটা পড়ল আমার ঘাড়ে। সর্দার পোড়ো হলেন বঙ্কিমদা। তিনি হেলেদুলে কুলীর পিছন পিছন আসছেন। তাঁরই উপরে বন্দোবস্তের ভার। কিন্তু মন্থর গমনে তিনি যখন এসে সম্মুখবর্তী হলেন রাগ ততক্ষণে বর্ষে গেছে। তখন হুকুম হলো, কুলীদের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দাও, যে যার বিছানা সুটকেস তুলে নাও, হোটেল পর্যন্ত হাঁটো।

এমন কিছুদূর নয়, তা হলেও অত রাত্রে অচেনা জায়গায় সেই আমাদের অনেক। হোটেলে গিয়ে আচার্য যদুনাথ দরাদরি করে বড় দেখে খান দুই ঘর খালি করিয়ে নিলেন। ফরাসের উপর ঢালা বিছানায় আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে শুতে গেলুম। খেতে বিশেষ কারো উৎসাহ ছিল না। আচার্য যে ঘরে ছিলেন আমিও সেই ঘরে। মুখ ফুটে সাথীদের সঙ্গে কথা বলব যে তার জো নেই। শীতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। জানতুম না দিল্লী কত ঠাণ্ডা। জানলে হয়তো আরো কিছু

গরম কাপড় আনা যেত। যদুনাথ এসব বিষয়ে হুঁশিয়ার। মুঘল বাদশাদের মতো তাঁর পরণে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পশমের পায়জামা। দিনের বেলা তার উপর চড়াতেন সাহেবী ট্রাউজার্স। রাত্রিবেলা বাঙালী ধুতী। কিবা দিন কিবা রাত্রি আঁটসাট যোধপুর পায়জামা তাঁর অঙ্গে থাকবেই।

তারপর সকাল সন্ধ্যা তাঁর টেবিলে বসে তাঁর বসওয়েল আমি লক্ষ্য করতুম তিনি কী কী খাদ্যের ফরমাশ দিতেন, তার জন্যে কত দাম দিতেন। ওরা চার্জ করত মাথা পিছু নয়, প্লেট পিছু। প্রত্যেক বারই যদুনাথের বিল উঠত এক পয়সা কম না, এক পয়সা বেশী না, ঠিক পনেরো আনা। আজকালকার বাজারে তার তিন গুণ। দুবেলা তিনি মাংস খেতেন, চাপাটি খেতেন, আর যাই খান মোটের উপর বিল দাঁড়াত নীট পনেরো আনা। বাজে খরচ করার লোক আচার্য যদুনাথ সরকার নন। কিন্তু বলকারক পথ্যের জন্যে যতদূর খরচ করতে হয় তিনি অকাতরে করতেন, খরচ বাঁচাতেন না।

আগ্রায় আমরা ভালো হোটেল পাইনি। এক হস্টেলে উঠলুম। যদুনাথ বললেন আমাদের মধ্যে যারা গোঁড়া হিন্দু তারা হালুইকরের দোকানে খাবার বন্দোবস্ত করতে পারে, যারা তা নয় তারা মুসলমানের সরাইতে খাবে, তাঁর সঙ্গে। আমি তো তাঁর পার্শ্বরক্ষী। চললুম মুসলমানের সরাইখানায় হাজরি খেতে। সেটা একটা অভিজ্ঞতা। দুটি মুসলমান রান্না করেছে এক হাঁড়ি মাংস আর এক হাঁড়ি ভাত। হাঁড়ি দুটো এলুমিনিয়মের। তার সঙ্গে না আছে প্লেট, না চামচ, না হাতা। ঘিরে বসে সবাই মিলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে তুলে আনতে হবে ভাত, তুলে আনতে হবে মাংস। খেতে খেতে বার বার এঁটো হাত ডুবিয়ে মুখে তুলতে হবে। কাণ্ড দেখে আমি তো স্তম্ভিত। লোক দুটোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আরো কয়েকটা পাত্র সংগ্রহ করা হলো।

সব মনে নেই, কিন্তু সেই সরাইখানায় আর আমরা যাইনি, আচার্যকে ওরা কথা দিয়ে কথা রাখেনি, তিনিও জানতেন না যে লোক দুটো নির্ভরযোগ্য নয়। ওদিকে গোঁড়া হিন্দুরা জিতে গেল।

আমাদের দলে কয়েকজন মুসলমান ছাত্র ছিলেন। তাঁদের এক-জনের নাম বশীর। বেজায় মোটা। আকবরের কীর্তি সিকান্দ্রা দেখতে গিয়ে সে যা ব্যাপার হলো তা সাংঘাতিক। আচার্যকে অন্যান্যদের সঙ্গে রেখে আমি নেমে এলুম উপরের তলা থেকে মাঝের তলায়। সিঁড়ির কাছাকাছি পায়চারি করতে থাকলুম। কী একটা ভাব মাথায় এসেছে। এমন সময় এক ভীষণ শব্দ। বশীর মিঞা ডিগবাজি খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে এলেন আমার খোঁজে। ভাগ্যিস আমার ঘাড়ে পড়েননি। নইলে আমিও পড়তুম টাল সামলাতে না পেরে। বশীর কিন্তু জখম হলেন না। আমরা ধরাধরি করে তাঁকে খাড়া করে দিলুম। বেচারা আচার্যের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কখন এক সময় পিছু হটতে গিয়ে উলটিয়ে পড়েছিলেন।

পাটনা কলেজে থাকতে আচার্য যদুনাথের সংস্পর্শে এর বেশী আসা হয়নি। পরে যখন তিনি দার্জিলিঙে বাড়ী করে অবসর ভোগ করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সপরিবারে সাক্ষাৎ করতে যাই। একবার কি দু'বার। তখন তাঁকে রোজ দেখতুম বাজার করতে যেতে। পায়ে হেঁটে। ওই তাঁর ব্যায়াম বা শরীরচালনা। গ্রীষ্মকালটা তিনি দার্জিলিঙে কাটাতেন। শীত পড়লে কলকাতায় নেমে আসতেন। পরবর্তী বয়সে দার্জিলিং তাঁর সহ্য হতো না। পুনার কাছে কী একটা জায়গা আছে, সেখানে তিনি সরদেশাই মহাশয়ের সঙ্গে মরাঠাদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতেন। মুঘলের পরেই তাঁর গবেষণার বস্তু ছিল মরাঠা রাজত্ব। তাঁর জীবনে শোক এসেছে বার বার। কিন্তু তাঁর রুটিন একদিনের জন্যেও বিপর্যস্ত হয়নি।

আমার বহু ভাগ্য এম. সি. সরকারদের সাহিত্যের আসরে আমি তাঁর সঙ্গে এক আসনে বসতে পেয়েছিলুম কয়েক বছর আগে। অত বড় সম্মান আর কোথাও কোনোদিন মেলেনি। মিলবে না। এবার আমি একটু দূরেই বসেছিলুম। সভাভঙ্গের পূর্বে একসময় দেখি তিনিই আমার কাছে সরে এসেছেন। আমাকে কুশল প্রশ্ন করছেন। জিজ্ঞাসা করছেন আমার পুত্রের কথা। কথাবার্তায় সম্পূর্ণ সহজ স্বাভাবিক ভাব। কেমন করে জানব যে আর একমাস পরে তাঁকে হারাব!

কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহুবার সম্মান দিতে চেয়েছিলেন, তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর সম্মান তাঁর শিষ্যদের কাছে চিরকাল অতি ঊর্ধ্বে থাকবে।

(১৯৫৮)

চন্দ্রগ্রহণ

পাকিস্তানকে আমি ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিদেশী রাষ্ট্র বলে ভাবতে শিখিনি। পাকিস্তান ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ, যেমন "ভারত" নামাঙ্কিত রাষ্ট্রও ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ। অঙ্গকে সর্বাঙ্গ বলে ভাবতেও আমি শিখিনি। নামকরণের অবাস্তবতা বাস্তবকে ঢাকা দিলে কী হবে, বাস্তব তো এই যে পাকিস্তান ও ভারত মিলে একই সত্তা, যেমন পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী মিলে একই সত্তা, যেমন ফরমোজা ও চীন মিলে একই সত্তা। এ বিচ্ছেদ হয়তো পোলাণ্ডের মতো শতাধিক বর্ষ স্থায়ী হবে, কিন্তু পোলাণ্ড যেমন ত্রিভঙ্গ হয়েও ভিতরে ভিতরে এক ছিল ভারতবর্ষও তেমনি দ্বিখণ্ড হয়েও এক আছে ও থাকবে। অষ্টাদশ শতাব্দী যাকে ত্রিধা বিভক্ত করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দী তাকে জোড়া

দিতে পারল না, তা বলে পোলাণ্ডের পুত্ররা হতাশ হননি, ইতিহাসকে অবিশ্বাস করেননি। বিংশ শতাব্দী এসে সার্থক করল তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের তপস্যা। আমরাও অপেক্ষা করব। একবিংশ শতাব্দীর জন্যে।

কিন্তু এই "আমরা" কারা? পাকিস্তানীরা নয় নিশ্চয়। পোলদের সঙ্গে এইখানেই তফাত। পাকিস্তানীরা চায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বড় জোর সহ অস্তিত্ব, যে যা চায় সে তা পায়। পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়েছে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই থাকবে। কিন্তু তাদের হিসাবে একটু ভুল ঘটেছিল। স্বাতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা দেখতে একই রকম, কিন্তু আসলে একই জিনিস নয়। পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। যেমন লেবানন বা জর্ডান স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। অবশ্য স্বাধীনতার ঠাট ষোলো আনা আছে। প্রেসিডেণ্ট, রাষ্ট্রদূত, সৈন্যদল, রাজা রাজদূত, সেনাবাহিনী। তা সত্ত্বেও সেই জিনিসটি নেই যা রাষ্ট্রকে করে স্বাধীন। স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিচালনায় দালালরা যার বেসাতি করে বেড়ায় তা আর যাই হোক স্বাধীনতার রসায়ন নয়। তাই মধ্যপ্রাচীর দেশগুলি অসুস্থ। আর আমাদের পাকিস্তানী ভ্রাতাদের ধারণা তাঁরাও মধ্যপ্রাচীর সন্তান। তাঁদের বিশ্বাস পাকিস্তান ভারতবর্ষে নয়, মধ্যপ্রাচীতে। নিজেদের জন্যে তাঁরা এক সেট নতুন ভূগোল ও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা আর ভারতবর্ষের কেউ নন, ভারতবর্ষও তাঁদের কেউ নয়।

যে দেশ দু'শো বছরের পরাধীনতার পর সদ্য মুক্ত হয়েছে তার একাংশের ধুরন্ধররা সারা মধ্যপ্রাচী জুড়ে সেল্‌স্‌ম্যানের মতো ব্যাগ হাতে ঘুরে বেড়ালেন। কী বিক্রী করতে? প্রথমত প্যান ইসলামিজম। দ্বিতীয়ত ইঙ্গ-মার্কিন শীতল যুদ্ধ। প্যান ইসলামিজমের মর্ম হলো, তোমরাও মুসলমান, আমরাও মুসলমান. আমাদের সকলের দুশমন হিন্দু,

সকলের দুশমন হিন্দুস্তান। আর ইঙ্গ-মার্কিন শীতলযুদ্ধের তত্ত্ব হলো, ইসলামের শত্রু কমিউনিস্ট রাশিয়া, ইসলামের মিত্র ধর্মের মিত্র ইংলণ্ড আমেরিকা, ওদের শিবিরে যেয়ো না, এদের শিবিরে জোটবন্দী হও। কাশ্মীরের ব্যাপারটা উপলক্ষ। এক উপলক্ষ না জুটলে অন্য উপলক্ষ জুটে যেত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি মুসলিমলীগের মূলনীতিরই সম্প্রসারণ। সে নীতি পাকিস্তানের স্বষ্টির পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছিল। হিন্দু মুসলমান দুই জাতি ও দুই চিরশত্রু। তাদের যে ঝগড়া সেটা ভারতের গৃহযুদ্ধ নয়। সেটা একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। সেটা হিন্দু মুসলমানের ঘরোয়া ঝগড়া হলে দুই পক্ষই একদিন না একদিন মিটিয়ে ফেলত, তৃতীয় পক্ষকে মাথা গলাতে দিত না। কিন্তু গোড়া থেকেই মুসলিম লীগ তৃতীয় পক্ষকে ভিতরে ডেকে এনেছে, পিঠে ভাগের ভার দিয়েছে বাঁদরকে। একদা সে পিঠের নাম ছিল সরকারী চাকরি, আইনসভার সদস্যপদ, মন্ত্রিমণ্ডলীতে আসন। পরে তার নাম হয় স্বতন্ত্র রাজ্য। আরো পরে তার নাম হতো হিন্দুস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ। কতকটা আত্মস্বার্থে, কতকটা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থে। সাধারণ মুসলমানের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে তাকে সমঝানো হতো সমস্তটা সাধারণ মুসমানের স্বার্থে। ইসলামের স্বার্থে।

পাকিস্তান তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই ভারতবর্ষ ছেড়ে মধ্যপ্রাচীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। কোলের আর দশটি শিশুর সঙ্গে আপন ভাগ্য মিলিয়েছে। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে ভাগ্য মেলায়নি, মেলাতে চায় নি। তার জন্মের পূর্ব হতেই তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে তার ভাগ্যযোজনা করেছে তার জননী মুসলিম লীগ। ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি সে তৃতীয় পক্ষকেই মিত্র বলে জেনেছে, ভারতকে শত্রু। কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে সে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে। এমন দৃশ্যও একদিন দেখা গেল যে আমেরিকা থেকে আধুনিকতম

মারণাস্ত্র এসে মোতায়েন হলো পাকিস্তানের মাটিতে। এর পরে আসবে সেইসব মারণাস্ত্র প্রয়োগ করার জন্যে বিদেশী সৈনিক। জমি ইজারা নেবে। ঘাঁটি বানাবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেষতম ব্রিটিশ সৈনিক যখন করাচী থেকে জাহাজ ধরে বিদায় নেয় তখন সারা ভারতবর্ষে দু'শো বছরের পরাধীনতা অস্ত যায়। আবার কি তার উদয় হতে করাচীতেই ? করাচীতে হলে সারা ভারতবর্ষেই হবে। স্বাধীনতার মতো পরাধীনতাও অবিভাজ্য। পাকিস্তান পরাধীন হলে ভারতও পরাধীন হয়। অথচ ইউনাইটেড নেশনসে গিয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আরজ পেশ করেন যে আন্তর্জাতিক সৈন্য এসে কাশ্মীরে বসুক। তার মানে সেইসব পুরাতন দাগী আসামী সাধু সেজে গৃহ-প্রবেশ করুক। স্বাধীনতার জন্যে লেশমাত্র দরদ থাকলে এ হেন প্রস্তাব কেউ করে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কখনো কুমীরের জন্যে খাল কাটে ? ইতিহাস থেকে কিছুই কি আমরা শিখিনি ?

"আমরা" বলছি আবার অভ্যাসবশে। না বলে পারিনে। পর ভাবতে পারিনে। পারব না কোনো দিন। তাদের মূলনীতি দেখে একদা বিমূঢ় হয়েছি। সেই মূলনীতির ফুল দেখে পরবর্তীকালে সন্ত্রস্ত হয়েছি। এখন দেখছি তারা নিজেরাই "ফুল" বনে গেছে। আরব জাহানে এমন একটিও দেশ নেই যেখানে পাকিস্তানীরা সম্মান বা শ্রদ্ধা পায়। আরবদের প্রত্যেকটি দেশে এখন জাতীয়তাবাদের জোয়ার এসেছে। সে জোয়ারে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বড় বড় ঐরাবত ভেসে যাচ্ছে। পাকিস্তানী প্রজাদের মুখ দেখতে চায় না কেউ। এঁরাও চোরের মতো লুকিয়ে বেড়ান। ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে জনতার অবজ্ঞা এড়ান। নয়তো অভিশাপ কুড়ান।

প্যান ইসলামিজমের তো এই পরিণাম। ওদিকে শীতল যুদ্ধের সওদাগরি করে মুনাফা যা পেয়েছেন তার মধ্যে কাশ্মীর পড়ে না।

আন্তর্জাতিক ফৌজ আসেনি। পাকিস্তানী ফৌজকেই কষ্ট করে লড়তে হবে কাশ্মীর নিতে। ইংরেজ মার্কিন ফৌজ কাঁধে কাঁধে মেলাবে না। বাগদাদ চুক্তির শর্তগুলি আবার এমনতর যে আরবদের সঙ্গে তুর্কি ইরানী ইংরেজদের লড়াই বেধে গেলে পাকিস্তানী ফৌজকেও ছুটতে হবে বন্দুক ঘাড়ে করে মুসলমান বেরাদরকে গুলি করে মারতে। শুধু তাই নয়, শর্তগুলির মধ্যে মোক্ষম শর্ত, চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি দেশে যদি রাজায় প্রজায় লড়াই বাধে তা হলে রাজার পক্ষ নিয়ে লড়বে চুক্তিবদ্ধ অপর সব দেশের ফৌজ। তার মানে ইরাকে যদি রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তবে রাজা ফৈজলকে ও উজীর নূরীকে বাঁচাবার জন্যে করাচী থেকে বাগদাদে ছুটবে পাকিস্তানী ফৌজ। কিন্তু ঘটনাগুলো এত সহসা ঘটে গেল যে ইরাকের রাজা উজীর পাকিস্তানকে ডাক দেবার আগেই পরলোকের ডাক পেয়ে চলে গেলেন। যদি বেঁচে থাকতেন, যদি ডেকে পাঠাতেন তা হলে পাকিস্তান পড়ত ফাঁপরে। ইরাকী বিপ্লবীদের গুলি করার পর আর বেরাদর বলে ভালোবাসা জানানো যেত না। আখেরে হয়তো তারাই জয়ী হতো, জয়ী হয়ে পাকিস্তানের চিরশত্রু হতো। ফৈজল আর নূরী মারা গিয়ে পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানী রাজনীতিকদের শিক্ষা হলো না। আবার সেই বাগদাদ চুক্তির কর্মসমিতিতে তাঁদের কালো মুখ দেখা গেল। এমনও তো হতে পারত যে ইরাকজর্ডান যুক্তরাজ্যের দাবীদার রূপে রাজা হুসেন ডাক দিতেন পাকিস্তানকে। এমনও তো হতে পারত যে ইংরেজরা স্বীকার করত না ইরাকের নতুন চালকদের। চালকরা চালাক লোক। তেলে হাত দেন নি। তাই ইংরেজরা রাজা হুসেনকে উস্কানি দেয়নি। তাই রাজা হুসেন পাকিস্তানকে ডাকেননি। ডাক পেলে পাকিস্তান কী করত? গেলে সারা আরব জাহানের মুসলমানরা বলত কালো ভেড়া। না গেলে চুক্তির খেলাপ হতো, ইংরেজ মার্কিন

মুরুব্বিরা বলতেন ঘেইমান । এই উভয়সঙ্কট থেকে ঘটনাচক্রে একবার পরিত্রাণ পাওয়া গেল, দু'বার পাওয়া গেল। তিন বারের বার পাওয়া যাবে কি ? যদি ইরানের শাহ বিপদে পড়ে হুইসল বাজান ?

এমনি করে প্যান ইসলামিজম থেকে এলো ভিন্ন দেশের মুসলমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে দুশমনি। স্বদেশের মুসলমানরা যে এর সমর্থক তা নয়। পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমান তো রাগ করবেই, যারা পাকিস্তানী ফৌজে চাকরি নিয়েছে তারাও রেগে আগুন। তারা কাফের বধ করে বেহেস্তে যাবে, তা নয় মুসলমান বধ করে দোজখে যাওয়া। সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে বলে কি তারা পরকাল বিকিয়ে দিয়েছে ? কোন্ মুখে মক্কায় যাবে হজ করবে তারা ? সব মুলুকের বেরাদরদের কাছে মুখ দেখাবে কী করে ? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে যে এ নিয়ে একটা আলোড়ন চলবে এতে আশ্চর্য ববার কিছু নেই। তা ছাড়া বাগদাদ চুক্তি হয়েছে প্রধানত সোভিয়েট রাশিয়াকে জব্দ করতে। হুকুম পেলে পাকিস্তানী সিপাহীদের ছুটতে হবে লাল ফৌজের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পাকিস্তানের বাইরে কে জানে কোন্ সীমান্তে। হয়তো উত্তর ইরানে কি পূর্ব তুরস্কে। বেচারাদের একবার বলা হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়ে লড়তে, ইউনাইটেড নেশনসের বকলমে। তখন তাদের না যাওয়ার অজুহাত হলো, ভারতীয়রা যাচ্ছে না, ভারতীয়রা যদি না যায় তবে পাকিস্তানীরা গেলে পাকিস্তান রক্ষা করবে কে ? তাই তো। কত বড় কুট প্রশ্ন। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ভারতীয়রা যাবে না, সেই অজুহাতে পাকিস্তানীরাও যাবে না, তা হলে বাগদাদ চুক্তির সার্থকতা কী ? পাকিস্তানীরা জানে যে এই সঙ্কটময় বিশ্ব পরিস্থিতিতে কেউ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় পাবে না। ওয়াশিংটন বা লণ্ডন থেকে হুকুম আসবে, চল। অমনি চলতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে। এই সব ভেবে পাকিস্তানের ফৌজী মহলে রীতিমতো

আলোড়ন চলছিল। বাগদাদ চুক্তির বাঘদের রুশ ভালুকের সঙ্গে লড়তে খুব একটা উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না।

ওদিকে আবার চীন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। কেময় আর মাৎস্যু আক্রমণ। এই নিয়ে যদি বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায় তা হলে ভারতীয়দের কী? ওরা তো তোফা আরামে কাশ্মীরে বসে থাকবে। পাকিস্তানীদের বন্দুক কাঁধে ছুটতে হবে ফরমোজায়। এরা যে সিআটো চুক্তির শরিক। কোন্ অজুহাতে চুক্তির খেলাপ করবে? করতে চাইলে শুনছে কে? মুসলমানের মুরগী পোষার মতো আমেরিকার পাকিস্তানী পোষা। যে কোনো দিন হুকুম আসবে, চল ফরমোজা। তো চলতে হবে ফরমোজা। আবার মজা দেখ। ভারতীয়রা মার্কিনের মিত্র নয়, বরং লাল চীনের দিকেই টেনে কথা বলে। তবু ওরাই পেয়ে গেল আমেরিকার আর্থিক সাহায্য। তা হলে নেহরুর পলিসি মন্দ কী? পাকিস্তানী রাজনীতিকদের পলিসি ভালো কিসে? রাজনীতিকদের উপর অন্য অনেক কারণে সাধারণ লোক ক্ষেপে রয়েছিল। শাসক ও সামরিক মহলের লোকও। কিন্তু বাগদাদ চুক্তি ও সিআটো চুক্তি থেকে সৈন্যদলের যে আসন্ন বিপদ সেই হলো রাজনীতিকদের ভাগ্যনিয়ামক। পাকিস্তানী মিলিটারি অফিসারদের কতক নাকি উপরওয়ালাদের ডিঙিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করার উদ্যোগ করে। সম্ভবত ইরাকী কায়দায়। একদিন হয়তো দেখা যেত প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী নিহত, অন্যান্য মন্ত্রীরা বন্দী, প্রধান সেনাপতি সামরিক আদালতে বিচারাধীন। এই সব ভীষণ ভীষণ সম্ভাবনার সম্মুখীন হবার জন্যে অপেক্ষা না করে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান সেনাপতিই প্রথম আঘাত হানলেন। সৈনিকদের অঙ্গে নয়, রাজনীতিকদের গায়ে। কাউকে যে প্রাণে মরতে হয়নি এই মহাভাগ্য। সবুর করলে অনেককেই কোরবানী করা হতো।

যা ঘটল তা অপূর্ব। একরাত্রেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সব ক'টা মন্ত্রীমণ্ডল বরখাস্ত। সব ক'টা বিধানসভা খতম। গোটা শাসনতন্ত্রটাই রদ। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত। সামরিক আইন জারি করে প্রধান সেনাপতির করে রাজ্যভার অর্পণ। না, য়্যায়সা কাম কোই কভি নেহি কিয়া। অন্যান্য দেশে এর নজির নেই। অন্যান্য দেশে রাজা উজীর মরে, গবর্নমেণ্ট বিতাড়িত হয়, কিন্তু দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক দল একসঙ্গে বিধ্বস্ত হয় না। এটা একটা ভূমিকম্প কি সাইক্লোন। একে যদি "কু" (Coup) বলে লাঘব করা হয় তবে এর তাৎপর্য হারিয়ে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধা হয়। ঘটনার ঘটকরা বলেছেন এটা একটা "বিপ্লব।" তা বিপ্লব নয়ই বা কেন? বিপ্লব কি সব দেশে একই রকমের হয়? দেশ অনুসারে তার রূপ বদলায়। পাকিস্তানে যা হয়েছে তা দু'জন ব্যক্তির দ্বারা হয়েছে, কিন্তু কেবল সেই দু'জনের ইচ্ছায় হয়নি। দু'জনের মস্তিষ্ক ও হস্ত, কিন্তু বহু জনের ইচ্ছা ও আয়োজন। না নইলে মুসলিম লীগের মতো বনেদী ও বলবান দলকে উচ্ছেদ করার মতো সাহস আসবে কোন্‌খান থেকে? মুসলিম লীগের পিছনে বহু ধনকুবের। বহুতর গুণ্ডা। দালাল অনেক। স্বেচ্ছাসেবকও অজস্র। মৌলবী মৌলানা এন্‌তার। বিদেশী ডিপ্লোমাটও বিস্তর। এই দশমুণ্ড রাবণকে যাঁরা নিপাত করেছেন তাঁরা রাম লক্ষ্মণ নয়, কিন্তু তাঁরা যা করেছেন তা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তা প্রগতিশীল। তাকে বৈপ্লবিক বলতেই বা এত কুণ্ঠা কেন? কুখ্যাত মুসলিম লীগ বাহান্ন বছরকাল বেঁচে থেকে মুসলমানদেরই যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, শিখ হিন্দুদের তো অপরিসীম। আরো কিছুদিন বাঁচলে আরো অকল্যাণ ডেকে আনত। প্রাইভেট আর্মি দিয়ে সে একদিন হিটলারী শাসন প্রবর্তন করত। যুদ্ধ ঘোষণা করত ভারতের বিরুদ্ধে।

যারা প্রতি মুহূর্তে গণতন্ত্রের অপব্যবহার করে গণতন্ত্র তাদের জন্যে

নয়। গণতন্ত্রের নামেই হিটলারকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল। হিটলার গণতন্ত্রের মাধ্যমেই বিবিধসম্মতভাবে জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। পাকিস্তানের ফেব্রুয়ারি নির্বাচন একটা রোমহর্ষক ব্যাপার হতো। মুসলিম লীগ তো খুন জখম ভয়প্রদর্শন করতই, তার মতো হিংস্র নয় এমন দুটি দলও ইতিমধ্যে ঢাকার আইন সভায় জঙ্গল আইন প্রবর্তন করেছিল। এক দল তো স্পীকারকে মেরে ভাগিয়ে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল যে তিনি উন্মাদ। আরেক দল আরেক কাটি সরেশ। ডেপুটি স্পীকারের দিকে কী একটা ছুড়ে মারল। তিনি মারা গেলেন। সাধারণ নির্বাচনের পাঁচ ছ' মাস আগে থাকতে এই! কার্যকালে দেখা যেত খণ্ডযুদ্ধ চলছে তামাম পাকিস্তান জুড়ে। তখন মিলিটারিকেই নিতে হতো শান্তিস্থাপনের দায়িত্ব। মার্শাল ল জারি করে সেটা তারা আগে থাকতে করেছে। আফসোসের কথা এই যে সাধারণ নির্বাচন হতে দেবে না। যা হবে তার নাম রেফারেণ্ডাম। যেমন ফ্রান্সে হলো। মন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব করে প্রেসিডেণ্ট ও গবর্নরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এক নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। পেশ করা হবে ভোটদাতাদের কাছে। তারা বলবে "হাঁ" কিংবা "না।" যাতে "হাঁ" বলে তার উপর নজর রেখে জনতার সন্তোষের জন্যে খাদ্য প্রভৃতির দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভেজাল বন্ধ করা হচ্ছে, চোরাকারবার দমন করা হচ্ছে, ঘুষ উচ্ছেদ করা হচ্ছে, ফাঁকিবাজদের খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমনি অসংখ্য কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে যা গণতন্ত্রের দ্বারা হলো না, অথচ হওয়া জরুরি। পশ্চিম পাকিস্তানে তো ফিউডাল প্রভুত্ব চলছিল। সেটা থামল। ভূমিসংস্কার হবে।

আমাদের মনে দুঃখ হচ্ছে এইজন্যে যে পাকিস্তান তো এমনিতেই বিচ্ছিন্ন ছিল, সে বিচ্ছেদ আরো গভীর হলো আমাদের ডেমোক্রেসীর

সঙ্গে ওদের ডিকটেটরশিপের বৈষম্য থেকে। এতদিন আমাদের একটা সান্ত্বনা ছিল ওরাও গণতন্ত্রী আমরাও গণতন্ত্রী। এখন আর সে সান্ত্বনা-টুকুও রইল না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে গণতন্ত্রের জন্যে ওদের প্রস্তুতি বরাবরই কাঁচা। মুসলিম লীগ তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ধুয়া ধরেছে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি চাই। কোন্ গণতন্ত্রে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি চলে? দাবীটাই অগণতান্ত্রিক। তার পর জিন্নাসাহেবের জেদ মুসলীম লীগই মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের আর কোনো পার্টি তিনি স্বীকার করবেন না। আর-কোনো পার্টিতে যে মুসলমান যোগ দেবে এটাও তাঁর সইবে না। এ যেন হিটলারের নাৎসী পার্টিকে জার্মানীর একমাত্র পার্টি করা। কিংবা স্টালিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে রাশিয়ার একমাত্র পার্টি করা। এটা ডিকটেটরশিপের সঙ্গে মেলে। গণতন্ত্রের সঙ্গে মেলে না। তার পর জিন্না যতদিন সরকারের বাইরে ছিলেন তিনিই ছিলেন লীগের স্থায়ী সভাপতি। তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। এটা গণতন্ত্রের সাধনা নয়। পাকিস্তান হবার পরে মুসলমান মন্ত্রীরাই হলেন সব সম্প্রদায়ের প্রজার শাসক, যদিও তাঁরা কেবল মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে দায়ী। পরে হিন্দু মন্ত্রী নেওয়া হলো, কিন্তু তাঁরাও শুধু হিন্দুর দ্বারা নির্বাচিত, হিন্দুর কাছে দায়ী। এসব কি গণতন্ত্রসম্মত? পাকিস্তানে যা চলছিল তা গণতন্ত্রের বিকৃতি। তবে তার সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছিল। যৌথ নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তিত হতে যাচ্ছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিলম্বিত এই সাধু প্রয়াস আপাতত ব্যর্থ হলো।

গণতন্ত্র ভোগীদের ভোগের বস্তু নয়, ত্যাগীদের ত্যাগের ধন। ইংলণ্ডের ছেলেরা দু' দুটো মহাযুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে তাদের দেশে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করেছে। ভারতবর্ষের ছেলেরাও প্রাণ দিয়েছে, জেলখানায়

পচেছে, নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্যে খেটেছে। কত লোকের জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে. সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনায় এলো স্বাধীনতা, জাতীয় তথা ব্যক্তিগত। এলো গণতন্ত্র, সেক্যুলার তথা সার্বজনীন। পাকিস্তান ইচ্ছা করলে এর অংশ পেতে পারত, কিন্তু তেমন ইচ্ছা তার হয়নি। পাকিস্তান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জিন্না সাহেব হয়ে বসলেন স্বতন্ত্র গবর্নর জেনারল। মাউণ্টব্যাটেনকে উভয় রাজ্যের গবর্নর জেনারল হতে দিলেন না। দিলে দেখতেন মাউণ্টব্যাটেন নিজের হাতে ক্ষমতা রাখেননি, ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন দিল্লীর কন্‌স্টি-টুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলিকে, করতেন করাচীর কন্‌স্টিটুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলিকেও। জিন্না গবর্নর জেনারল হয়ে মাউণ্টব্যাটনের হস্তান্তরিত ক্ষমতা নিজের হাতে নিলেন, করাচীর কন্‌স্টিটুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলিকে দিলেন না। সেই সময় থেকে ক্ষমতা বরাবর গবর্নর জেনারেলের হাতেই রয়ে যায়, কোনো কালেই কন্‌স্টিটুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলির হাতে যায় না। জিন্না অকালে দেহত্যাগ করলে লিয়াকত আলি সে ক্ষমতা জোর করে নিজের মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন, নাজিমুদ্দিন গবর্নর জেনারল হয়েও ক্ষমতাহীন ছিলেন। লিয়াকতের মৃত্যুর পর নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হয়ে ভেবেছিলেন তিনি লিয়াকতের মতোই ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু গোলাম মহম্মদ গবর্নর জেনারল হয়ে নাজিমুদ্দিনকে পরে একসময় বরখাস্ত করে প্রমাণ করলেন যে ক্ষমতা গবর্নর জেনারলভোগ্য। ইস্কান্দর মির্জা গবর্নর জেনারল হয়ে কন্‌স্টিটুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলি রদ করলেন। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর কন্‌স্টিটিউশন তৈরি করার জন্যে একটি সংস্থা সৃষ্টি করা হলো বটে, কিন্তু কেউ তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেইনি। গবর্নর জেনারেলের পদ উঠে গেল, তাঁর স্থানে বসলেন সেই মির্জা সাহেব। অন্বয়ক্রমে ক্ষমতার সারবস্তু তাঁর হাতেই রয়ে গেল। প্রধান মন্ত্রীরা তাঁর অনুগ্রহনির্ভর ছিলেন। সুহ্‌রাবর্দী

সাহেবকে তো তিনি বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করলেন। পাকিস্তানের যা ঐতিহ্য তাতে সম্প্রতি যা ঘটে গেল তা অঘটন নয়।

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী গবর্নর জেনারেলের চেয়ে বা প্রেসিডেণ্টের চেয়ে প্রবল সে দেশের প্রজাশক্তি রাজশক্তির চেয়ে প্রবল। কারণ প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রজাশক্তির প্রতীক ও রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীক। প্রজাশক্তি প্রকাশ পায় সাধারণ নির্বাচনে। প্রজার প্রকৃত প্রতিনিধি নির্ধারণে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সূচিত হয় সৈন্যসামন্ত দিয়ে, রাজ-পুরুষ সমষ্টি দিয়ে। পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন প্রথমাবধি স্থগিত, রাজনীতিকদের নানা মুনির নানা মত। প্রধান মন্ত্রীর পিছনে তাই প্রজাশক্তি নেই, তিনি প্রেসিডেণ্টের তুলনায় হীনবল। পক্ষান্তরে সৈন্য-সামন্তের সংঘশক্তি ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে প্রেসিডেণ্টের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তিনি এখন প্রধান সেনানায়কের কৃপানির্ভর। রেফারেণ্ডাম দিয়ে এই ব্যবস্থাই কায়েম করিয়ে নেওয়া হবে।

পাকিস্তানীরা গোড়াতেই ভুল করেছে নিজেদের ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও মধ্যপ্রাচীর সামিল করে। মুসলিম লীগও আরো আগে থেকে ভুল করেছিল ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনকে শত্রু ভেবে, মিত্র না ভেবে। পাকিস্তান যে ইংরেজ অধিকারমুক্ত হলো সে তার নিজের চেষ্টায়ও নয়, একার চেষ্টায়ও নয়। ভারতের চেষ্টায়, কংগ্রেসের চেষ্টায়। তেমনি পাকিস্তানে যে গণতন্ত্রের একটা ঠাট বজায় ছিল সেও ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির উপর জোর দেওয়ার ফলে। কংগ্রেসের প্রতি একদা মুসলিম লীগ মিত্রভাবাপন্ন হয়েছিল। মিতালি ঘটিয়েছিলেন স্বয়ং জিন্না সাহেব। ১৯১৬ সালের সেই মিতালি ১৯২৯ সালের পর হাওয়া হয়ে যায়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা দাবী সমর্থন করলে মুসলিম লীগ ইংরেজের চক্ষুঃশূল হতো, লক্ষ্মী ছেলে হতো না। এর পর লীগের

পলিটিক্স হয় একবার কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষা, একবার ইংরেজের কাছে গিয়ে আরো বেশী আদায় করা। শেষে যখন কংগ্রেস বুঝিয়ে দিল যে ইংরেজের সঙ্গে কথা বলার একমাত্র হক্‌দার কংগ্রেস, সমগ্র দেশের জন্যে যা পাওয়া যাবে কংগ্রেসের সঙ্গে তারই অংশীদার হবে লীগ প্রভৃতি অন্যান্য দল, তখন জিন্না সাহেবও সমঝিয়ে দিলেন যে মুসলিম 'জাতি'র তরফ থেকে ইংরেজের সঙ্গে তথা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলার একমাত্র হক্‌দার মুসলিম লীগ। কংগ্রেস যদি চায় স্বাধীন ভারতবর্ষ তো মুসলিম লীগ চায় পাকিস্তান। এর পর ধাপে ধাপে মুসলিম লীগ চলে যায় গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের সৎপ্রভাবের বাইরে, তার ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতবর্জিত গণতন্ত্রবর্জিত। পাকিস্তান অর্জনের পর সে সম্পূর্ণ ভুলে যায় যে কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে গণতন্ত্রের সঙ্গেও বিচ্ছেদ। পাকিস্তানও ভুলে যায় যে ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে গণতন্ত্রের আবহাওয়ার সঙ্গেও বিচ্ছেদ।

ওরা ভুল করেছে ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমরাও তেমনি ভুল করব যদি ভাবি পাকিস্তানে যে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে ভারতে তা লাগবে না, ভারত তার থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রাকৃতিক ভারতবর্ষ ও তার জনগণ এখনো এক ও অবিভাজ্য। চন্দ্রের একপ্রান্তে গ্রহণ লাগলে অন্যপ্রান্তেও তার জের চলে। রাহু হয়তো কাশ্মীর গ্রাস করতে উদ্যত হবে না, কিন্তু ঘরের এক অংশে ডিকটেটরশিপ প্রবর্তিত হলে অন্য অংশে তার প্রভাব পড়বেই। বিশেষত তার নৈতিক প্রভাব। এর মধ্যে পাকিস্তান একটা লেজেণ্ড সৃষ্টি করেছে। ইচ্ছা করলেই ঘুষ বন্ধ করা যায়, চুরি বন্ধ করা যায়, ভেজাল বন্ধ করা যায়, ফাঁকি বন্ধ করা যায়, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা যায়। ভারতের নেতাদের কাছে ভারতের জনগণ প্রত্যাশা করবে এই লেজেণ্ডের উপযুক্ত উত্তর। নিরুত্তর থাকলে বা ভুল উত্তর দিলে নেতৃত্ব বিপন্ন। নেতৃত্ব চলে যাবে সেনানায়কদের

হাতে। চন্দ্রগ্রহণ আংশিক না হয়ে সর্বাঙ্গীন হবে। পাকিস্তান গায়ের জোরে ভারতের সঙ্গে পারবে না, কিন্তু কে জানে হয়তো একদিন নৈতিক জয়ে জয়ী হবে। সুতরাং আমাদের আত্মসন্তুষ্টির লেশমাত্র অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

পাকিস্তানের এই নয়া জমানা কি স্থায়ী হবে? হবার সম্ভাবনাই বেশী। তার একটি কারণ তো তার পররাষ্ট্রনীতি। সে ইরান তুর্কী প্রভৃতি বহু দেশে সৈন্য পাঠাতে চুক্তিবদ্ধ। অথচ আরবদের সঙ্গে চীনাদের সঙ্গে রুশদের সঙ্গে লড়তে নারাজ। যেদিন লড়াই করতে ডাক পড়বে তার মুখে "না" কথাটি মানাবে না। সে বলতে পারবে না যে, "ভারতীয় ফৌজ তো যাচ্ছে না, পাকিস্তানী ফৌজ যাবে কী করে?" কিন্তু অনায়াসে বলতে পারবে, "আমার নিজের ঘরেই সঙ্কট। ঘর সামলাবে কে?" কথাটা মিথ্যা নয়। তরুণ কর্নেলরা রুখে দাঁড়াবে। প্রবীণ সেনাপতিদের কোতল করবে। তার মানে আর একটা "কু" (Coup)।

তার পর রাজনীতিকদের এমন কোনো সংঘ নেই যা আমাদের কংগ্রেসের মতো দেশের সব অঞ্চলের লোককে একসূত্রে গাঁথবে। মুসলিম লীগ একদা ইসলামের নামে তা করতে পেরেছিল, পরে পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রতিপত্তি লোপ পায়, পশ্চিম পাকিস্তানেও তার বল ক্ষয় হয়। সুন্নী প্রভুত্ব শিয়াদের অসহ্য, আহ্‌মদিয়াদের ভাগ দিতে উভয়ের গাত্রদাহ। ইতিমধ্যে বাঙালী পাঞ্জাবী সিন্ধী পাখতুন প্রভৃতি ভাষাগত বা উপজাতিগত ভেদবিভেদ মাথা তোলে। পাঞ্জাবী প্রভুত্ব আর-সকলের অসহ্য, আর-সবাইকে ভাগ দিতে পাঞ্জাবীদের গাত্রদাহ। এর উপর ধনিক শ্রমিক সমস্যা আছে। ক্যাপিটালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট। এমন একটি মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা শক্ত যাকে সব অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের সব ভাষার সব উপজাতির লোক বিশ্বাস করবে। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন

স্বার্থের কোয়ালিশন তো বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেল। বহুরূপীর মতো তার ঘন ঘন রং বদলায়। পাকিস্তানে একটামাত্র সংঘ আছে। তার নাম পাকিস্তানী ফৌজ। তাতে পাঞ্জাবীদেরই আধিপত্য, তা সত্ত্বেও তাতে গোঁজামিল নেই, দুর্বলতা নেই। একমাত্র পাকিস্তানী ফৌজই পাকিস্তানের ঐক্য অটুট রাখতে সমর্থ। সে যদি কোনো দিন অসতর্ক হয় তবে পাকিস্তান বলকানে পরিণত হবে। সেইজন্যে পাকিস্তানী ফৌজ রাজনীতিকদের বিশ্বাস করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে না। অবশ্য এটা মন্ত্রীপরিষৎ থাকবে। তার হাতে পরিমিত ক্ষমতা। রাজনীতিকদের consolation prize.

এরকম একটা ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে পারে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। নৈতিকতার লেজেণ্ড। ভূমিসংস্কার ইত্যাদি সর্ববিধ সংস্কার। রেফারেণ্ডামে "হাঁ" ভোট পাবার জন্যে তো বটেই, তার পরে নির্বাচনে অনুকূল রায় পাবার জন্যেও, তার পরে রাজ্যচালনায় নিরঙ্কুশ হবার জন্যেও, জনগণের জন্যে সত্যি সত্যি কিছু করে দেখানোর জন্যেও। সামরিক নেতৃত্ব থাকতে এসেছে। মার্শাল ল বেশী দিন চলবে না, কিন্তু স্পেনের ফ্রাঙ্কো নেতৃত্বের মতো পাকিস্তানের আয়ুব খান্ নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ডিকটেটরশিপ কোথাও কি সহজে হটেছে বা স্বেচ্ছায় অঙ্কুশ হস্তান্তর করেছে?

পাকিস্তানে ডেমোক্রেসীর পুনঃপ্রবর্তনের আশা অতি ক্ষীণ। তাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এটা বাইরের তথ্য। সে ভেঙে পড়েছে এইটেই ভিতরের সত্য। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে পাকিস্তান আর একটা আফগানিস্তান। তার প্রগতি হবে নিশ্চয়, কিন্তু ভারতের মতো গণতান্ত্রিক ধারায় নয়, মধ্যপ্রাচীর অন্যান্য দেশগুলির মতো অর্ধসামরিক অর্ধগণতন্ত্রী ধারায়। বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলতে এই বোঝায় যে কোনো বড় পরিবর্তনই উপরের দিক থেকে ঘটিয়ে দেওয়া হবে না, নিচের দিক থেকেই

তার বিকাশ হবে, বিবর্তন হবে, এমন কি আবর্তন হবে। পাকিস্তানের বিপ্লব বা আবর্তন নিচের দিক থেকে হলে একেও এক প্রকার গণতন্ত্র বলা যেত। যেমন চীনের ওঁরা বলেন পীপল্স্ ডেমোক্রেসী। কিন্তু এ যা হলো তা উপরের দিক থেকে। তাই একে কোনো প্রকার গণতন্ত্র বলবার জো নেই। না পার্লামেণ্টারি ডেমক্রোসী; না পীপল্স্ ডেমোক্রেসী। একদিন হয়তো নিচের দিক থেকে বিস্ফোরণ ঘটবে। ডিকটেটরশিপ ধ্বসে পড়বে। সময় বুঝে ডিকটেটর স্বয়ং অপসরণ করতে পারেন, যেমন ইংরেজরা অপসরণ করল। তার দেরি আছে।

আমরা তা হলে কী করব? আমরা পরীক্ষা করে দেখব আমাদের গণতন্ত্র কী পরিমাণ সবল, কী পরিমাণ শক্ত। ভারতের গণতন্ত্রেরও একটা চেক-আপ দরকার। নইলে হঠাৎ কোন্‌দিন এ ব্যবস্থাও ব্রেক-ডাউন করবে। মহানেতারা আছেন বলে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু তাঁরা কেউ অমর নন। তাঁদের বয়সও হয়েছে। তাঁরা একে একে অস্ত গেলে ভারতের আকাশে তারাগণের অভাব হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আকাশ অন্ধকার হতে পারে। জিন্না লিয়াকৎ আলী জীবিত থাকলে কি পাকিস্তানের এ হাল হতো? ডেমোক্রেসী ডিকটেটর-শিপ নয়, কিন্তু এরও পদে পদে নেতৃত্বের প্রয়োজন। চার্চিল প্রভৃতির লীডারশিপ না হলে ইংলণ্ডের গণতন্ত্র কেবল নিচের দিকের বাষ্পের জোরে চলত না। উপরের দিকেও নির্বাচিত বা জনসমর্থিত চালক থাকা চাই। লীডারশিপ কিন্তু ডিকটেটরশিপ নয়। এই সূক্ষ্ম প্রভেদটা অনেকের চোখে পড়ে না। তাই তাঁরা গান্ধী জবাহরলালকেও বলেন ডিকটেটর। লীডার ও ডিকটেটরে তফাত এইখানে যে লীডার বলেন, "আমার কথা শোন, নয়তো আমি লীডার থাকব না।" আর ডিকটেটর বলেন, "আমার কথা শুনতেই হবে, নয়তো আমি ডাণ্ডা মেরে শোনাব। আমার হাতেই সৈন্যবল।" দেশের লোকের অনাস্থা দেখলে কিংবা

সহকর্মীদের অনাস্থা লক্ষ করলে কিংবা নির্বাচনে হেরে গেলে লীডার পদত্যাগ করেন। ডিকটেটর অনড়, যতদিন না যুদ্ধে পরাজয় বা সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটেছে।

গণতন্ত্রের পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির সঙ্গেই আমরা পরিচিত। এ পদ্ধতি যদি আমাদের গায়ে না বসে তবে আমরা এর অদলবদল করতে পারি। আর যদি একে পরিত্যাগ করতেই হয় তবে এর চেয়ে যা উন্নততর তারই জন্যে করব। ডিকটেটরশিপের জন্যে নয়।

(১৯৫৮)

একেশ্বরবাদ

তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে আরো দুটি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান্ হলেন অধিকন্তু প্রধান মন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছায় রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জাকে পদত্যাগ করতে হলো। তখন আয়ুব হলেন রাষ্ট্রপতি তথা প্রধান সেনাপতি, প্রধান মন্ত্রী পদটা রদ করা হলো। বারোজন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি শাসনপরিষৎ গঠন করা হলো। এঁদের বলা হবে মন্ত্রী। অথচ এঁরা মন্ত্রী নন। পরামর্শ দাতা। আয়ুব ইতিপূর্বেই নিরঙ্কুশ হয়েছিলেন। এবার হলেন নিষ্কণ্টক।

আর মির্জা? মির্জা গেলেন মানে মানে নির্বাসনে। সেখানে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার মর্ম, আপাতত বছর তিনেক লাগবে ঘর ঝাঁট দিতে, ময়লা সাফ করতে। তার পরে প্রবর্তন করা হবে গণতন্ত্র। তার পদ্ধতিটা হবে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মার্কা। অর্থাৎ যিনি প্রেসিডেণ্ট তিনিই প্রধান মন্ত্রী। নামে নয়, কাজে। তিনি রাষ্ট্রেরও মাথা,

সরকারেরও মোড়ল। একাধারে রাজা ও প্রজাপ্রতিনিধি। প্রজা ও প্রজাপতি। দ্বৈতাদ্বৈত।

মির্জা সাহেব বোধ হয় ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। আমেরিকা যেমন তার রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে তেমনি আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে প্রজাপ্রতিনিধিদের কংগ্রেসকে। কংগ্রেস যদি ইচ্ছা করে প্রেসিডেণ্টকে তার সামনে হাজির করিয়ে তাঁকে ইম্‌পীচ করতে পারে, তাঁর জবাবদিহি নিতে পারে, তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। এরূপ ঘটনা আমেরিকার ইতিহাসে এক আধবার ঘটেও গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টদের মাথার উপর ইম্‌পীচমেণ্টের খড়্গ ঝুলতে থাকে। এই তো সেদিন কে একজন প্রজাপ্রতিনিধি বললেন, "দাঁড়াও, আইসেনহাওয়ারকে ইম্‌পীচ করছি।" এমন উক্তি আয়ুব খানের কানে সুধাবর্ষণ করত না, তিনি যদি হতেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। তিন বছর পরে তিনি যদি সত্যি সত্যি নতুন এক শাসনতন্ত্র রচনা করে শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হন তা হলে কি তিনি ইম্‌পীচমেণ্টের খড়্গ প্রতিনিধিসভার হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন? বিশ্বাস তো হয় না।

তারপর আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ও তার অধীনস্থ আদালতগুলি প্রেসিডেণ্টের হস্তক্ষেপের ঊর্ধ্বে ও কংগ্রেসের খপ্‌পরের বাইরে। রাজাপ্রজা কারো সাধ্য নেই যে ধর্মাধিকরণের ক্ষমতা খর্ব করে বা হরণ করে বা তার সমান ক্ষমতার অধিকারী হয় বা তার ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলে। সামরিক আইন জারি করে আমেরিকার প্রজাদের শাসন করা যায় না, করলে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট দেখে নেবে। আমেরিকার জনতা কোর্টকেই সমর্থন করবে, নিষ্ক্রিয় থাকবে না। তারা বৃন্দাবনের লোক নয় যে বলবে প্রেসিডেণ্টই একমাত্র পুরুষ, আর সকলে নারী।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র ক্ষমতাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ দিয়েছে

প্রেসিডেণ্টের হাতে। এক ভাগ কংগ্রেসের হাতে। এক ভাগ সুপ্রীম কোর্টের হাতে। যে যার এলাকায় ঈশ্বর। এ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা। ক্ষমতার উৎস নিচের দিকে। অসংখ্য ছোট ছোট অঞ্চল। তারা উপরের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত নয়। যে যার সীমার মধ্যে স্বাধীন। এত বেশী নির্বাচন আর কোনো দেশেই নেই। কর্মচারীরাও বহুক্ষেত্রে নির্বাচিত। গভর্নরাও নির্বাচিত। সেই পৌণে দু' শ' বছর আগে থেকে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, কী করে এটা সম্ভব। আমাদের দেশে তো মিউনিসিপালিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড বা জেলা বোর্ড শতকরা নব্বুইটা অচল। যেখানে সচল সেখানে ওয়ান-ম্যান শো। গণতন্ত্রের শিক্ষানবীশী হয় স্বায়ত্বশাসনের এই সব প্রতিষ্ঠানে। ইংলণ্ডেও হাতে খড়ি হয় কাউন্টি কাউন্সিলে। নিচের দিকে যদি গণতন্ত্রের পাট না থাকে, লোকে যদি মিলেমিশে কাজ করতে না শেখে, হাতে কলমে সংসার চালাতে না শেখে তা হলে বৃহত্তর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। অযোগ্যতার পরিচয় দেয়। কর ধার্য করতে সাহস নেই, আদায় করতে সাহস নেই, আদায় করলে বারো ভূতে লুটে খাবে। এই যদি হয় ঐতিহ্য তা হলে আয়ুব খান্ তার শেষ পরিণতি। পাকিস্তানের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে আজকাল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে থাকে বকেয়া দাখিল করতে। একমেবা-দ্বিতীয়মের আদেশ।

আমেরিকায় একজন প্রেসিডেণ্ট আছেন, তাঁর কোনো প্রধান মন্ত্রী নেই, এর থেকে মনে হতে পারে আমেরিকার রাজনীতিতে একমাত্র খোদাতালা আছেন, তাঁর কোনো দোসর নেই। কিন্তু সেটা ভুল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়করা সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই এমন এক ব্যবস্থার সূত্রপাত করে গেছেন যার কোনোখানে

ডিকটেটরশিপের জন্যে এতটুকু ছিদ্র নেই। অথচ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মন কষাকষি বা বল কষাকষি চলবে তার জন্যেও পথ খুলে রাখেননি। প্রধান মন্ত্রী থাকলে প্রশ্ন ওঠে, প্রজাপক্ষের মোড়ল কোন্ জন? প্রেসিডেন্ট? না প্রধান মন্ত্রী? আমরা হলে উত্তর দিতুম, কেন? প্রধান মন্ত্রী। আমাদের চিন্তাধারা ইংরেজের মতো। ইংলণ্ডের রাজা যেমন ভারতের প্রেসিডেন্ট তেমনি। রাজনীতির উর্ধ্বে। তাঁকে রাজনীতির আসরে নামালে তাঁরও একটা প্রতিপক্ষ স্বীকার করে নিতে হবে। রাজার আবার প্রতিপক্ষ কে? গণতন্ত্রে রাজার কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না। তা বলে তিনি একেশ্বর নন। তিনি বরং আমাদের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। প্রকৃতিই সক্রিয়। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রজার প্রতিনিধিরাই সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইংরেজ মার্কা শাসনতন্ত্রের এই তত্ত্ব মার্কিন মার্কা শাসনতন্ত্রে নেই। সেখানে এক ঈশ্বর নয়। তিন ঈশ্বর। প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ কর্মকর্তা! কংগ্রেস অর্থাৎ আইনকর্তা। সুপ্রীম কোর্ট অর্থাৎ বিচার কর্তা। পাকিস্তানী একেশ্বরবাদীরা কি তিন ঈশ্বরবাদের তাপর্য বুঝবে?

আপাতত একেশ্বরবাদই পাকিস্তানের ললাটলিখন। একে খণ্ডাবার উপায় নেই, থাকলেও তা আমাদের হাতে নয়। আরো অনেক দেশকে এর ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। খোদ ইংলণ্ডও তো তিন শতাব্দী আগে ক্রমওয়েলের মিলিটারি ডিকটেটরশিপ আস্বাদন করেছে। রাজার মাথা কাটা গেল, প্রজার মাথা হেঁট হলো, সেই অভিজ্ঞতার স্থায়ী ফল হলো রাজায় প্রজায় সন্ধি। রাজা হলেন শাসনতান্ত্রিক রাজা, তাঁর শাসনক্ষমতা চলে গেল প্রজাপ্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের হাতে, পার্লামেন্টের আস্থাভাজন মন্ত্রীদের হাতে। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীদের একজন হলেন প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার অধিকারী। মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব বলে গোড়ায় কিছু ছিল না। ক্রমে

ক্রমে তাও বিবর্তিত হলো। ইংরেজরা পদে পদে ঠেকে শিখেছে, কেউ তাদের শিখিয়ে দেয়নি। আমরা দেখে শিখেছি, তাই আমাদের শিক্ষা তাদের মতো পাকা নয়। আমাদের গণতন্ত্র অপরের দ্বারা ও অপরের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রবর্তিত। আমাদের নিজেদের দ্বারা বিবর্তিত নয়। সেইজন্যে কাঁচা। আমাদেরি ঘরের একাংশে তার পরিণতি দেখে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। পাকিস্তানের ছিদ্রান্বেষণ করে সময়পাত করলে কি আমাদের কাঁচা গণতন্ত্র পাকা হবে?

না, আমাদের গণতন্ত্র স্বতঃবিবর্তিত নয়, সুতরাং পাকা নয়। প্রবর্তিত গণতন্ত্র একদিন না একদিন কেঁচে গেছে পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে। ইটালীর গণতন্ত্র পঞ্চাশ বছর ধরে পোক্ত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের ধোপে টিকিল না। যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলোর সমাধান দিন দিন কঠিন হয়ে উঠল, তাই মুসোলিনি একটা শর্টকাট বাতলে দিলেন। জার্মানীর গণতন্ত্র উঠল কাইজারের পতনের পরে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলো নিয়ে তারও হয়রানির একশেষ। পনেরো বছর পরে বেকারসংখ্যা যখন অভ্রভেদী তখন হিটলার এসে ঢিট করে দিলেন। সেও এক শর্টকাট। রাশিয়াতে গণতন্ত্র কোনো কালেই চালু হয়নি, সুতরাং লেনিনের দ্বারা যেটা ঘটল সেটা আর যাই হোক গণতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সংক্ষিপ্ত সড়ক নয়। প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ ছিল মার্কস্ এঙ্গেল্স প্রভৃতি কমিউনিস্ট পিতামহদের মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন। শত বর্ষ ধরে তার সাধনা চলেছিল ইউরোপের নানা দেশের মুনিজনের মানসে। মুসোলিনি বা হিটলারের পিছনে সে রকম কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তাঁরা রাশিয়ায় লেনিনের সাফল্য দেখে ইটালীতে ও জার্মানীতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগ লক্ষ্য করে নিজেরাই অগ্রণী হয়ে ক্ষমতা হস্তগত করেন। গণতন্ত্র বাধা দিতে পারল না, কারণ পাকিস্তানের মতো দেউলে হয়েছিল।

আমাদেরও গণতন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান হবার সময় এসেছে। একেই তো এ জিনিস কাঁচা। তারপর এর মূলনীতি আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত বিশেষ কারো জানা নেই। ইংরেজ তাড়াতেই আমরা ব্যস্ত ছিলুম। মৌমাছিকে তাড়িয়ে মৌচাক দখল করে মধুপান করতেই আমরা ব্যস্ত রয়েছি। মূলনীতি সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ কোথায়? বহু শতাব্দীর অভ্যাস, তাই সাধারণ লোক মনে করে গবর্নমেণ্ট হচ্ছে কল্পতরু। আবেদন নিবেদন আবদার আন্দোলন এই সব করে ফল পাড়তে হয়। ফল কী করে ধরবে তার জন্যে মাথাব্যথা নেই। আর অসাধারণদের ধারণা ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে একবার গাছের ডালে উঠে বসতে পারলেই হলো। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি এইরূপ একটি উপায়মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয় তা হলে জোর করে রাইটার্স বিলডিঙ ও রাজভবন দখল করা যাবে। তা হলেই মোক্ষফল লাভ। এই যাদের মনোবৃত্তি তারা তো কথায় কথায় আইন নিজের হাতে নেবেই। তাদের সায়েস্তা রাখার জন্যে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হয়, সৈন্যের সংখ্যা বাড়াতে হয়। নির্বাচনী বলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও শান্তি নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

ইংলণ্ড আমেরিকার লোক ভাবতেই পারে না যে একবার নির্বাচন যুদ্ধে হারজিত স্থির হয়ে যাবার পর আবার মাঠেঘাটে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা উঠতে পারে। সরকারের উপর বিরূপ হলে তারা সভাসমিতি করে, শোভাযাত্রাও করে, কিন্তু আইন নিজের হাতে নেয় না। একবার আইন নিজের হাতে নেওয়া রেওয়াজ হয়ে গেলে আর আইনসভা বা পার্লামেণ্টের দরকার থাকে না। আইন পাস করার প্রয়োজনও থাকে না। তখন জঙ্গল আইন। জোর যার মুলুক তার। গণতন্ত্রের মূলনীতি লঙ্ঘিত হয় এতে। সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা বিকৃত

হয়। অতি সহজেই তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার হারায়। ইংলণ্ডের লেবার পার্টির চরমপন্থীরা একদা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পিছনে ধনিকদের কারসাজি দেখে এমন বিতৃষ্ণ হয় যে সোজাসুজি ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবে। তখন তাদের দূরদর্শীরা তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করে এই বলে যে একবার যদি খেলার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় তা হলে খেলায় ফাউল করে রক্ষণশীলরাই আগে জিতবে। ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ প্রবর্তন করবে। আমাদের এ দেশেও সেই ভয় আছে। অনেকে রাতারাতি প্রগতি চান, দুর্নীতি তাঁদের সহ্য হয় না, সর্বত্র তাঁরা ধনিকদের কারসাজি দেখেছেন। কিন্তু এর প্রতিকার যদি অবৈধ উপায়ে হয় তা হলে সেই অবৈধ উপায়টা জলচল হয়ে যাবে এবং ধনীরা অকাতরে ডিকটেটরশিপের বায়না দেবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। গুণ্ডা লাঠিয়াল দিয়ে গদি দখল করা ধনীদের পক্ষেই আরো সম্ভব।

গান্ধীজী উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেয়ে উপায়শুদ্ধির উপর জোর দিয়ে গেছেন। গণতন্ত্রকে যদি ক্ষমতা ভোগ করার উপায় বলে মনে করা হয় তবে উপায়টা সব সময় শাসনতন্ত্রের চৌহদ্দির ভিতরে থাকা চাই। যদি অধিকার রক্ষার উপায় বলে গ্রহণ করা হয় তা হলেও সেই কথা, তবে সরকারপক্ষ শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে বা শাসনতান্ত্রিক পন্থা বন্ধ করলে প্রজাপক্ষ সত্যাগ্রহ করতে পারে। এটা সব সময়ের অস্ত্র নয়, শেষ অস্ত্র।

গান্ধীজীর মনে বরাবর একটা শঙ্কা ছিল যে দেশ যদি সামরিক উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে তবে মৌচাকটা সামরিক নেতাদের হবে, রাজনীতিকরা হবেন তাঁদের হাতের পুত্তলিকা। কিন্তু ভারতবর্ষ যে-ভাবে স্বাধীন হলো তাতে সে রকম কোনো শঙ্কার কারণ রইল না। তা সত্ত্বেও তিনি শঙ্কাপোষণ করলেন সামরিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি দেখে,

সামরিকতার প্রেস্টিজ বৃদ্ধি দেখে। এবার তিনি বলেছিলেন সিভিলের সঙ্গে মিলিটারির সংঘাত এদেশেও দেখা দিতে পারে, কারণ সিভিল যে উপরে, মিলিটারি যে নিচে, এটা এদেশে চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হয়নি। তাঁর কথা ভারতবর্ষের সিকি অংশে অর্থাৎ পাকিস্তানে ফলেছে। বাকী অংশে অর্থাৎ ভারতে ফলবে কি না জোর করে বলবে কে? রাজনীতিকরা মোরগের মতো নিশ্চিত হতে পারেন, বলতে পারেন ভারতের গণতন্ত্র দৃঢ়মূল। কথাটা পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় সত্য। কিন্তু ফ্রান্সের তুলনায়? কতকালের বনেদী গণতন্ত্র ফ্রান্সের! কত পুরাতন তার পার্লামেণ্ট! দেখা গেল সেই পার্লামেণ্টের কাছে যিনি গ্রাহ্য, সৈন্যদলের কাছে তিনি অগ্রাহ্য। কোনো রাজনীতিককেই তারা তাদের উপর হুকুম চালাতে দেবে না। যদিও পার্লামেণ্টের তিনি আস্থাভাজন। বোঝা গেল প্রজাসাধারণের দ্বারা যথাবিহিতভাবে নির্বাচিত পার্লামেণ্টটার উপরেই তাদের অবজ্ঞা। তারা গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করে না। তারা চায় তাদেরি মনোনীত একজন সৈনিক রাষ্ট্রশাসক হবেন। হলোও তাই। সেনাপতি দ্য গল উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। পার্লামেণ্ট আত্মহত্যা করল। তাঁর তৈরি শাসনতন্ত্রই দেশের লোক গলাধঃকরণ করেছে। এবার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে অধিক হবে। প্রধান মন্ত্রী যে কেমন করে প্রেসিডেণ্ট ও পার্লামেণ্ট উভয়ের মনোরঞ্জন করবেন তা আমরা তো ভেবে পাইনে। প্রতিপক্ষ যারা হবে তারা কার প্রতিপক্ষ? রাষ্ট্রপতির না মন্ত্রীমণ্ডলীর?

আতঙ্ক ভালো নয়, কিন্তু সতর্কতা ভালো। দেশের নাড়ীজ্ঞান গান্ধীজীর যেমন ছিল আর কার তেমন আছে? গান্ধী নেই বলে কি রিয়ালিটি বদলে গেছে? তা নয়। প্রকৃত সত্য এই যে জাতীয়তাবাদ এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র এখনো পরীক্ষাধীন। যেমন ইটালীতে। যেমন জার্মানীতে। অথচ নানা বিষয়ে এ দেশ রুশ

চীনের কাছাকাছি। ইংলণ্ড আমেরিকার নয়। কোটি কোটি অশিক্ষিত বুভুক্ষু নরনারী দশ বিশ বছরের মধ্যে অবস্থার উন্নতি আশা করে। নিরাশ হলে নির্বাচনে যোগদান করবে কি না সন্দেহ। নির্বাচনে যদি লোকের অরুচি ধরে যায় তা হলে গণতন্ত্রের মূল কোথায় যে দৃঢ়মূল হবে! গণতন্ত্র তখন হবে অমূল তরু। তখন দেশে দুটিমাত্র দল থাকবে। একটি একেশ্বরবাদী ক্ষমতাগ্রাসী দল। একটি বিবেকচালিত সত্যাগ্রহী দল। প্রজাপক্ষের শেষ প্রাচীর হচ্ছে সত্যাগ্রহ। লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। গান্ধীজী যাবার আগে লোকসেবকসংঘ গড়তে বলে গেছেন। সেটা রাজনীতিকদের সংঘ নয়। গঠনকর্মীদের সংঘ। আবশ্যক হলে এঁরা সত্যাগ্রহ করবেন। আমাদের কতক লোককে রাজনীতি ছেড়ে প্রজানীতি নিয়ে থাকতে হবে। বিনোবাজীর মতো। আর কতককে প্রহরী হতে হবে। বিনিদ্র প্রহরী।

(১৯৫৮)

ও-পারের সঙ্কট

"সমকাল" নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি উচ্চকোটির মাসিক-পত্রে আমাদের পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত হাস্যরসিক আবুল ফজল সাহেবের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। "সাহিত্যের সঙ্কট" কিন্তু হাস্যরসাত্মক নয়। বরং করুণরসের পর্যায়ে পড়েছে। এ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

সঙ্কট কোন্ দেশে নেই? আমরাও যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি সেটাও একপ্রকার সঙ্কট। কেবল জীবনের পক্ষে নয়, সাহিত্যের পক্ষেও। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের সঙ্কট হলো অন্য জিনিস। তার কয়েকটি বিশেষত্ব

আছে। প্রথম বিশেষত্ব হলো ভাষাঘটিত। আবুল ফজল বলছেন, "স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার উপর চলেছে এক উৎপাত—যে ভাষা হচ্ছে সাধারণের আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার।" এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উর্দু সহজে হটবে না, বাংলাকে একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবে, এই পর্যন্ত আপোসের সম্ভাবনা, বাকীটা সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত হবে, নয়তো ইংরেজীকেই মধ্যস্থ পদে চিরকাল বহাল রাখতে হবে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব আর একটু গভীর স্তরের। ভাষাঘটিত নয়, সাহিত্যের একান্ত আবশ্যক উপাদানঘটিত। আইরিশ কবি ইয়েটসের মতে মাটির নিচে 'Popular memory' ও 'Ancient imagination' না থাকলে সাহিত্য রস টানতে পারে না। আবুল ফজল বলছেন, "আজ আমাদের popular memory ও ancient imagination খণ্ডিত, শিল্পীর মন মানস বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল ও নোঙরহীন।" এ কথা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেও খাটে। তবে অতখানি নয়। বাঙালী জাতি যদিও ভেঙে দু'খানা হয়েছে, ভারতেরও দ্বিভাজন ঘটেছে যদিও, তবু আমাদের এ প্রান্তে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে, কন্‌টিনিউইটি রয়েছে। আমরা আমাদের দেশের নাম রেখেছি "ভারত" ও রাজ্যের নাম "পশ্চিমবঙ্গ"। আর আমাদের বন্ধুরা তাঁদের দেশের নাম দিয়েছেন "পাকিস্তান" ও প্রদেশের নাম "পূর্ব পাকিস্তান"। স্মরণাতীত এক আদিকালের সঙ্গে আমরা অন্বয়রক্ষা করছি। আমাদের জনগণের স্মৃতি চলে যায় রামায়ণ মহাভারতের যুগে, তাদের প্রাচীন কল্পনাকে দোলা দেয় অশোকের সিংহচতুষ্টয়, বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন। পাকিস্তান মাত্র এগারো বছরে কতটুকু ঐতিহ্য সঞ্চয় করবে! তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হলে আরব পারস্যের দিকেই তাকাতে হয়। কিন্তু সেসব দেশের সঙ্গে ধারাবাহিকতার দায় তাদেরই জনগণের, পাকিস্তানী

জনগণের নয়। তারা যে পরিমাণ রস পাবে এরা সে পরিমাণ পেতেই পারে না। ইতিমধ্যেই টান পড়ছে। অথবা তাকাতে হয় ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিভাগপূর্ব অতীতের দিকে, বঙ্গীয় মুসলমানদের বিভাগ-পূর্ব অতীতের দিকে।

তাইতো আবুল ফজল বলছেন, "আমাদের যা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা রচনা সবই আমরা যখন বাঙালী ছিলাম তখনকার—বিষাদ-সিন্ধু, উন্নত চরিত্র, মহৎ চরিত্র, মোস্তফা চরিত, পারস্যপ্রতিভা, মানব-মুকুট, শান্তিধারা, আবদুল্লাহ্, মোমেনের জবানবন্দী, নকৃসীকাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ইত্যাদি। নজরুলের রচনার উল্লেখ নাই বা করলাম।"

আশা করি পাকিস্তানের তরুণ লেখকরা তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। আমারই তো খান কয়েক বইয়ের নাম মনে পড়ছে যা পাকিস্তান সৃষ্টির পরে লেখা, অথচ সমান উল্লেখযোগ্য। তা হলেও ফজল সাহেবের মূল যুক্তির খণ্ডন হয় না। সেটা এই যে বাঙালী থাকতে যে উপাদান সুলভ ছিল পাকিস্তানী হয়ে সে উপাদান দুর্লভ। পূর্বপাকিস্তান চার দিক থেকে কোণঠাসা। ঘর থেকে আঙিনায় যাবার পথ নেই। লাফ দিয়ে আকাশে উড়ে দেউড়িতে যেতে হয়। যেতে পারে ক'জন! জনসংখ্যার শতকরা একভাগও কোনো দিন করাচী, লাহোর, পেশাওয়ার, রাওলপিণ্ডি দেখতে পাবে না। সেসব অঞ্চল থেকে যারা আসবে তারাও জনগণের শতকরা একভাগ নয়। সুতরাং জনগণের স্মৃতি আর প্রাচীন কল্পনা খণ্ডিত থেকে যাবেই। সাহিত্যের ঘরে উল্লেখযোগ্য ধনরত্ন সঞ্চিত হবে না। খেদ স্বাভাবিক।

তৃতীয় বিশেষত্ব আবুল ফজলের নিজের জবানীতে দিই।

"আমরা হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, না হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যিক। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের আমরা কেউই

নয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যের শুধু যে ভাষা পৃথক তা নয়—তার মন-মেজাজ, জীবনজিজ্ঞাসা, এমন কি দৃষ্টিভঙ্গী আর শিল্পরূপ পৃথক। পাকিস্তানের দুই অংশের ইতিহাস ভূগোল ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব এত দুস্তর যে কল্পনায় সাধারণ নাগরিক একটার সঙ্গে আর একটার যোগসাজস করতে অক্ষম। এই দূরত্ব প্রাকৃতিক বলেই আরো দুর্লঙ্ঘ্য। ইংরেজের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর যতখানি মিল আমাদের ততখানি মিলও নেই। ওদের বংশ এক, ধর্ম এক, ভাষা এক, আচার বিচার পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত এক। তবু ওরা এক রাষ্ট্র বা এক জাতি হতে পারেনি। আমাদের তো এক ধর্ম ছাড়া সব ব্যাপারেই গরমিল। একমাত্র ধর্মই যদি রাষ্ট্র বা জাতির মূলভিত্তি হয় তা হলে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান এক রাষ্ট্র বা এক জাতি নয় কেন? ইংরেজ আর ফরাসীই বা নয় কেন? অথচ ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মাঝখানে একটিমাত্র খালের ব্যবধান, যে খাল পূর্ব পাকিস্তানের ব্রজেন দাসও সাঁতরে পার হতে পারে।"

এই সব 'কেন'র উত্তর আমরা তো দিতে পারিনে, দিতে পারেন স্বয়ং আবুল ফজল সাহেব আরেক নিঃশ্বাসে। পরবর্তী প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "পাকিস্তান না হলে আমাদেরও থাকতে হতো মেজরিটির মুখাপেক্ষী হয়েই। আর থাকতে হতো ভারতের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় হয়েই। জাতি হতে পারতাম না আমরা কখনো। হতে হলে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহু জিনিস ত্যাগ করে বৃহত্তর ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যেতে হতো। তাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আয়ার্লণ্ডকে যেমন বৃহত্তর ও সর্বগ্রাসী ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হওয়ার আন্দোলন করতে হয়েছিল তেমনি আমাদেরও বৃহত্তর ও সর্বগ্রাসী ভারতীয় প্রভুত্বের

বাইরে স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে পাকিস্তান আন্দোলন না করে উপায় ছিল না।"

ইংরেজ আর আইরিশের বিরোধ এইজন্যে নয় যে ইংরেজরা মেজরিটি ও আইরিশরা মাইনরিটি। তাদের বিরোধের হেতু তাদের দুই স্বতন্ত্র দ্বীপে বাস, দুই স্বতন্ত্র ইতিহাস। তারা দুটি ধর্মসম্প্রদায় নয়, তারা দুটি জাতি। বহু শতাব্দী ধরে ইংলণ্ড আয়ার্লণ্ডকে শাসন করে এসেছিল। আইরিশদের সংগ্রামও বহু শতকব্যাপী। কী করে এর সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার তুলনা হয়! আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে কে তাকে পরাধীন করে রেখেছিল? ভারত না ইংলণ্ড? মুসলমানদেরই বা পরাধীন করে রেখেছিল কারা? ইংরেজরা না হিন্দুরা?

আমার মনে হয় আবুল ফজল সাহেবের হাতে কবি ইয়েটসের রচনা পড়ে এই বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। তিনি যদি ইউরোপের ইতিহাস পড়ে থাকতেন আরো ভালো উপমা খুঁজে পেতেন। ঐ আয়ার্লণ্ডের কথাই ধরা যাক। আইরিশরা যখন বহু শতকের সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতার যোগ্য হলো, আর যখন তাদের অধীনে রাখা যায় না, তখন তাদের মধ্যে বোনা হলো পাকিস্তানের বীজ। প্রোটেস্টাণ্ট মাইনরিটি বলল ক্যাথলিক মেজরিটির প্রভুত্ব অসহনীয়। ক্যাথলিকদের হাতে ক্ষমতা আসার আগেই প্রোটেস্টাণ্টদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। আলস্টারকে কেটে নিয়ে বাকী অংশ আইরিশ বিদ্রোহীদের দেওয়া হলো। এখানেও তাই হয়েছে। যারা দেশের জন্য লড়ল না, দেশের শত্রুকে তাড়াল না তারা বিদেশীর মধ্যস্থতায় পাকিস্তান কেটে নিল। কেটে নেবার জন্যে যে পরিমাণ রক্তপাত করতে হয় সে পরিমাণ রক্তপাত করল ও করালো। কিন্তু সে রক্ত বিদেশীর রক্ত নয়। সিরাজের শত্রুরাই হলো পাকিস্তানের মিত্র। আর সিরাজের মিত্ররা পাকিস্তানের শত্রু। এগারো বছরেও এর এদিক ওদিক হয়নি। একুশ বছরেও হবে কি না সন্দেহ। তাই যদি

হয় তবে ফজল সাহেবকে মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান যারা চেয়েছিল তারা অখণ্ড ভারতের অখণ্ড মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যেই চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উপর মাদ্রাজী বম্বেওয়ালা মধ্যপ্রদেশী উত্তরপ্রদেশী বিহারী মুসলমানদের স্বত্বাধিকার আছে। এরা যে চিরকাল সংখ্যালঘু হয়ে ভারতে পড়ে থাকবে ও তার দরুণ নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহু জিনিস ত্যাগ করতে বাধ্য হবে এমন কী কথা আছে? একদিন হয়তো বলে বসবে, "মুইও জাতি হমু। মোর যেথায় হোমল্যাণ্ড সেথায় যামু।" এই 'জাতি'র জন্যেই তো দুধারে 'ন্যাশনাল' হোমল্যাণ্ড করে গেছেন খোদ কায়দে আজম। না করে নাকি উপায় ছিল না।

আবুল ফজল সাহেব যথার্থই বলেছেন যে একটা সম্প্রদায় 'জাতি' হতে চেয়েছিল, সম্প্রদায় হয়ে সন্তুষ্ট হয়নি। কিন্তু 'জাতি' হয়েছে কি? না ক্ষমতা হাতে পেয়ে সম্প্রদায় থেকে গেছে? নেশন এখনো পাকিস্তানে দানা বাঁধল না, কোনো দিন বাঁধবে কিনা সন্দেহ। সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে জাতীয় চেতনায় পৌঁছানো যাবে না। তার জন্যে যে কারো মাথাব্যথা পড়েছে তার লক্ষণ নেই। এমন কি আবুল ফজল সাহেব স্বয়ং যখন পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন তখন মোসলেম অতীতই দেখছেন, মিশ্র অতীত নয়। সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, গত সহস্র বৎসরে ভারত-পাকিস্তানের মাটিতে যা কিছু ফুটেছে তা এদেশেরই ফুল। কেউ মনে রাখেনি যে গোলাপ এসেছিল ইরান থেকে, তেমনি কারো খেয়াল নেই যে 'ঠাকুর' শব্দটা তুর্কী ভাষা থেকে নেওয়া। বাপকে যে 'বাবা' বলি সেও তুর্কীদের কাছ থেকে শিখে। এমন দেশকে দু'ভাগ করলেই তার কোনো অংশ অমিশ্র হয় না, হতে পারে না। কি ভারতে কি পাকিস্তানে কোনোখানেই কোনো একটা সম্প্রদায় একাই একটা 'জাতি' হবে না, সব ক'টা সম্প্রদায় মিলেই একটা 'জাতি'

হবে। যেমন এ-পারে, তেমনি ও-পারে। 'জাতি' হলে তার চেতনা জাতীয়তার লাইন ধরে পেছোবে আর এগোবে, সাম্প্রদায়িকতার লাইন ধরে নয়।

রাজনীতি এককে দুই করে ক্ষান্ত হয়নি, এমনভাবে বিছিন্ন করেছে যে মিশ্র অতীতের ধারা লোপ পেতে বসেছে। দিল্লী আগ্রা লখনউ আলিগড় পাটনা কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের এ-প্রান্তে বা ও-প্রান্তে সাত শ' বছরের অমিশ্র মোসলেম ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বলে যদি কিছু থাকে তবে তাও বিলুপ্ত হতে চলল। সঙ্কট দেখা দেবেই তো। রাজনীতিক সঙ্কট মোচনের জন্যে আমেরিকা আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক সঙ্কট মোচন তার কর্ম নয়। এ-ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষী নই, পরস্পরমুখাপেক্ষী। তবে আমার বিশ্বাস পাকিস্তানের মতো মধ্যযুগীয় ভূখণ্ডকে আধুনিক যুগে উপনয়নের জন্যে আমেরিকান পুরোহিতের প্রয়োজন আছে। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ধ্যান ধারণাও আসবে, পশ্চিমতরমুখী সাধনাও আসবে। মক্কা ছাড়িয়ে মরক্কো ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে পাকিস্তানীদের। সেটা ভালো। তাতে সঙ্কট মিটবে না, কিন্তু পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় হাওয়া বদল হবে।

তা হলেও আমি আবেদন করব যে সারা ভারত পাকিস্তান জুড়ে চলাচল স্বচ্ছন্দ হোক, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হোক। নয়তো সাহিত্যের সঙ্কট কাটবে না। না ও-পারে, না এ-পারে। যদিও এ-পারের অবস্থা এখনো এতদূর গড়ায়নি যে, "তরুণ প্রবীণ সকলের মুখে আজ এক কথা। কেন লিখব? কার জন্যে লিখব? কে ছাপবে? কে পড়বে?"

(১৯৫৯)

সমাপ্ত